আশাবরী

বনফুল

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, (১৫ই আগস্ট) শ্রাবণ ১৩৬৭

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন.
রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসত্যহরি পান, উপেন্দ্র প্রিন্টিং প্রেস, ১৬ ভীম ঘোষ লেন,
কলিকাতা ৬ কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

পুত্রপ্রতিম

ডাক্তার শ্রীদ্বারিকানাথ ঘোষ

কল্যাণীয়েষু

আশাবরী

নাম সত্যেন। সত্যেন ভদ্র।

ছোঁড়াটা হতভাগা। বয়স বছর পঁচিশ। মামার বাড়িতে থেকে ইতিহাসে এম-এ পাস করেছে। চাকরি জুটছে না। অনেক দরখাস্ত করেছে চারদিকে। কোথাও কিছু হয় নি। মামা যদিও তাড়িয়ে দেন নি, মামীমা যদিও বলেন নি আমি আর তোমার জন্যে দুবেলা খাবার তৈরি করতে পারবো না, তবু চলে এসেছে সে সেখান থেকে।

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। দেখে অনেক ফেরিওয়ালা ফেরি করছে, অনেক রিকশাওয়ালা রিকশা টানছে, অনেক কুলি মাল বইছে, অনেক মজুর রাস্তা তৈরি করছে, অনেক মূর্খ লোক গতর খাটিয়ে পয়সা রোজগার করছে। সে কিন্তু কিছুই করছে না পয়সা রোজগার করবার জন্যে। ওসব করবার সামর্থ্য নেই তার। চাকরি জুটলে করতে পারত, চাকরি জোটে নি। ফ্যানের তলায় চেয়ারে বসে কেরানীগিরি করবার সুযোগ যদি পেত অনায়াসে করতে পারত। কিন্তু সে সুযোগ পায় নি। পাওয়ার আশাও নেই। তাই এখন ভিক্ষা করে। এ-ও একরকম উপার্জন। পেটটা চলে যায়। রাস্তাতেই শোয়। কখনও কোনও বড় লোকের বাড়ির বারান্দায়। কখনও বা স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে। কখনও বা ফুটপাথের ওপরই। সে কিন্তু নিতান্ত নিঃসম্বল নয়। একটা ছেঁড়া কাঁথা যোগাড় করেছে। সেইটে পেতেই শোয় রাত্তিরে। সেইটে জড়িয়ে পুলিন্দার মতো করে বগলে নিয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। গায়ে ছেঁড়া একটা আলখাল্লা কোট। কোটের পকেটে একটা খাতা। আর একটা পেন্সিল। কবিতা লেখে। আধুনিক ধাঁচের কবিতা লেখবার চেষ্টা করে। সব সময়ে কিন্তু হেঁয়ালি বানাতে পারে না। মানে বোঝা যায়, মামুলী মানে।

তবু চেষ্টা করে সে। কবিতা না লিখে পারে না। ওটাই একমাত্র অবলম্বন। আর একটা অবলম্বন আছে—প্রিয়া। যে প্রিয়া নেই সেই প্রিয়া। যে প্রিয়া বাস্তবে দেখা দেবে না, যার রূপ নিত্য নূতন, সেই প্রিয়া। তার সঙ্গে সে রোজ কথা কয়।

শহরে অনেক পার্ক আছে, স্কোয়ার আছে। তারই একটাতে ব'সে কবিতা লেখে সে দুপুরে। দুপুরে লোকজনের ভিড় থাকে না। কবিতা লিখে প্রিয়াকে শোনায়।

সেদিনও তাই করছিল। কল্পনা করছিল চাঁ চাঁ দুপুরের রোদে তার পাশে বসে আছে টুকটুকে ফরসা একটি মেয়ে। মাথায় ঘোমটা নেই। পিঠে লম্বা-চওড়া কালো বেণী দুলছে পিঠ-কাটা ব্লাউসের উপর। মুচকি মুচকি হাসছে আর নখ খাচ্ছে।

আকাশ, ছুঁচো আর ফটকিরি
ভালবাসে পালক-মেঘের চচ্চড়ি।
আমি বাসি না।
আমি ভালবাসি
গরম গরম ফুলকো লুচি,
যে লুচি ভাজা হচ্ছে
কুষ্টি-উনুনের ধিকি ধিকি আঁচে
মিষ্টি দৃষ্টির পরদার আড়ালে।
আমার ইচ্ছে দেখে
হাসছে গ্যয়টে
শেক্সপীয়রকে জড়িয়ে,
ন্যাংচাচ্ছে গেঁটে বাত,
হাঁচছে শীলার,
কাশছে টলস্টয়।
ওরা ভাবছে
আমি সঙ্গত করব ওদের সঙ্গে তবলা নিয়ে।

কিন্তু করব না
কভি নেই।
আমি একক, আমি স্বতন্ত্র, আমি অনন্য
আমি ভিখারী হয়েও সম্রাট।
মনের বাসনার খিড়কির ফাঁক দিয়ে
বেরিয়ে এল কামনা-টিকটিকি ল্যাজ ঘুরিয়ে,
বললে আমিও।
উপরে চেয়ে দেখলাম
আকাশ নীরব
সে কিছু বলছে না।
তুমিও বলবে না?

সে জানে তার পাশে প্রিয়া নেই। তবু চেয়ে দেখল একবার। রোজই দেখে। দেখতে পেল দূরে আর একটা লোক ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছে তার দিকে।

এগিয়ে এল লোকটা।

'কি লিখছিলে—'

কেমন যেন লজ্জা হল তার। খাতা পেন্সিল পকেটে পুরে সলজ্জ হাসি হেসে বলল, 'কিছু না'। পরক্ষণেই আত্মপ্রকাশ করল ভিক্ষুকটা।

বলল—'সমস্ত দিন খাই নি। কিছু দেবেন?'

লোকটা ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়েই রইল একটু। তারপর একটা দশ নয়া ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল।

পয়সাটা কুড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে পার্ক থেকে। দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ ফুটপাথের উপর।

জনস্রোত চলছে। আর চলেছে মোটর গাড়ির সারি। চলেছে ট্রাম বাস লরি। চলেছে টেম্পো, ঠেলাগাড়ি।

তারপরই হঠাৎ একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠল একটু দূরে। লোক জমে গেল। কাকে যেন মারছে অনেকে মিলে। একটা পকেটমার ধরা পড়েছে। সে-ও এগিয়ে গেল। দশ-বারো বছরের ছোঁড়া একটা, নির্দয়ভাবে মারছে তাকে। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে।

'আর কখনও করব না—আমাকে ছেড়ে দাও, আর মেরো না, তোমাদের পায়ে পড়ি।'

তারস্বরে চীৎকার করছে ছেলেটা।

ওরা কিন্তু ছাড়বে না। মেরেই চলেছে। তারপর পুলিস এল। ও সরে গেল সেখান থেকে।

গেল একটা খবরের কাগজের স্টলে। সেখানে কাগজগুলো উল্টে 'নিরুদ্দেশ প্রাপ্তি' অংশটা দেখল। রোজই দেখে। না, তার মামা তার খোঁজে কোন বিজ্ঞাপন দেয় নি।

চলে গেল হাঁটতে হাঁটতে। হাঁটতেই লাগল অনেকক্ষণ। তারপর একটা চানাচুরওলার দেখা পেল। চানাচুর কিনল খানিকটা। তাই চিবুতে চিবুতে আরও খানিকক্ষণ হাঁটল। পা ব্যথা করতে লাগল। বসে' পড়ল শেষে ফুটপাথের ওপরই একটা বাড়ির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে।

॥ ২ ॥

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ দিয়ে হাঁটছিল। পাশে সামনে পিছনে লোক চলছে। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া। নানা রঙের পোশাক পরা। অধিকাংশই সাহেবী পোশাক। কেউ কাউকে চেনে না। সবাই চলেছে নিজের ধান্দায়। রাস্তার উপর ট্র্যাফিক জ্যাম। হর্ন বাজাচ্ছে মোটরগুলো। একটা সাইকেল ট্রিং ট্রিং ট্রিং করতে করতে এগিয়ে এল। তার ওপর বসে আছে এক অদ্ভুত মূর্তি।

মাথায় গান্ধী টুপি, গায়ে লাল কামিজ, পরনে কালো চোং প্যান্ট। তার পিছনে তাকে জড়িয়ে বসে আছে একটা মেয়ে। তার মাথায় চুল বব্ করা, চোখে কাজল, বড় বড় দাঁত ওপরের ঠোঁট দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করছে। হতভাগা ছোঁড়াটা দাঁড়িয়ে পড়ল সেখানে। জ্যাম হওয়ার জন্যে সাইকেলটা আর চলছিল না। এক পা মাটিতে রেখে সাইকেলটাকে কেৎরে দাঁড়িয়ে ছিল গান্ধী টুপি। মেয়েটাও নেবেছিল।

'সমস্ত দিন খাই নি মা।'

হাত পেতে দাঁড়াল সে মেয়েটার কাছে। মেয়েটা ঘাড় অন্য দিকে ফেরাল। তখন দেখা গেল তার ঘাড়ে একটা কালো জড়ুল আছে। জড়ুলের উপর পাউডার লেগেছে একটু। ছোঁড়াটার অকারণে মনে হল, চুল বব্ না করলে জড়ুলটা ঢাকা পড়ত। মোটর হর্ন দিচ্ছে চারদিকে। নানা জাতের হর্ন। শুধু মানুষের নয়, শব্দেরও ভিড় হয়ে গেল চারদিকে। হঠাৎ খুব জোরে জোরে হুইসলও বাজতে লাগল। পুলিসের হুইসল। একগাদা লোক রাস্তা থেকে উঠে পড়ল ফুটপাথের উপর। একটা লেবুওলা ফুটপাথে লেবুর পশরা বিছিয়ে বসেছিল। সে হাঁ-হাঁ করে উঠল জোরে। তার লেবুর উপর দিয়ে লোক চলেছে। হুমড়ি খেয়ে সে শুয়ে পড়ল লেবুগুলোর উপর। তারপর তার কি হল সে আর দেখতে পেলে না। জনতার ধাক্কায় সে ছিটকে গেল। হঠাৎ লক্ষ্য করল সেই জড়ুলওয়ালা মেয়েটা আর নেই। সে দাঁড়িয়ে আছে একটা মেওয়ার দোকানের সামনে। সামনেই একটা প্রকাণ্ড জ্যাম্।

কাজুবাদাম। তার খুব প্রিয় জিনিস। চেয়ে রইল খানিকক্ষণ জারটার দিকে। তার চোখে বোধহয় লোলুপতা ফুটে উঠেছিল। দাড়িতে মেহেদী লাগানো দোকানদার হঠাৎ ভারি গলায় প্রশ্ন করল—, 'ক্যা দেখতো হো?'

'কাজু।'

'বারো রুপিয়ে কে-জি।'

ছেলেটা দাঁত বের করে বললে, 'মায় ভুখা হুঁ। মগর পয়সা নেহি হ্যয়।'

দাড়িতে মেহেদী লাগানো লোকটা তখন পকেট থেকে ছোট্ট একটা আয়না আর চিরুনি বার করে চুল আঁচড়াতে লাগল। রাস্তায় হৈ হৈ উঠল একটা। আবার জনতার একটা ধাক্কা। খুন হয়ে গেছে, খুন হয়ে গেছে—চীৎকার করতে করতে একটা লুংগিপরা লোক বোঁ করে ঢুকে পড়ল পাশের গলিটাতে।

সে-ও ঢুকে পড়ল। খুব সরু গলি। গলির মুখেই একটা কল থেকে অনবরত জল পড়ছে। জলের কলটা ভাঙ্গা। অনেক দিন থেকেই জল পড়ছে বোধ হয়। নীচের শানটা ক্ষয়ে গেছে। আর একটু গিয়ে দেখতে পেল, তুটো ছোঁড়া ব্যাটবল খেলছে। একজনের হাতে একটা কেরোসিন কাঠের ব্যাট, অন্যজনের হাতে একটা ন্যাকড়ার বল। পাশের রাস্তাতেই যে তুমুল কাণ্ড হচ্ছে সে খেয়ালই নেই ওদের। খেলে চলেছে। তাদের পেরিয়ে আর একটা ছোট্ট দোকান পাওয়া গেল। দোকানের মালিক যুবতী নারী একজন। যুবতী দেখলেই মন ছোঁক ছোক করে ছোঁড়ার। দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা ভিতরের দিকের একটা ঘুপচি ঘরে অন্তর্ধান করল হঠাৎ। বেরিয়ে এল হোঁতকা গোছের ঘাড়েগর্দানে একটা লোক। তার গলায় কালো সুতো দিয়ে লটকানো একটা মাতুলী। দোকানে ছোট্ট একটা গ্লাস কেস। কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে লাল কাঁকড়ার ঝাল। কিছু শুকনো আলুর দম। কিছু বেগুনি ফুলুরিও। হোঁতকা লোকটা তার পানে ভ্রূকুটি করে চাইল একবার। তারপর দোকানের ঝাঁপটা তুলে দিল। আবার চলতে লাগল সে। কিছু দূরে গিয়ে দেখল একটা আবগারির দোকান। দোকানে বসে আছেন যিনি, তিনি গীতাপাঠে মগ্ন। বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছিল বইয়ের মলাটের উপর স্বর্ণাক্ষরে লেখা—শ্রীমদ্ভাগবত

গীতা।

'সমস্ত দিন খেতে পাই নি বাবা।'

গীতা নিরুত্তর।

'সমস্ত দিন খেতে পাই নি বাবা।'

আবার গীতা নিরুত্তর।

'সমস্ত দিন খেতে পাই নি বাবা।'

গীতা জানলা বন্ধ করে দিলেন।

আবার হাঁটতে লাগল সে সত্যিই বড্ড ক্ষিধে পেয়েছিল তার। একটা বন্ধ দুয়ারের কড়া নাড়তে লাগল অবশেষে।

কপাট খুলল।

'কি চাই—'

'বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে বাবা—'

পাশের ঘর থেকে কে যেন গাঁক করে উঠল, 'মাফ কর বাবা। ওরে কপাটটা বন্ধ করে দে—'

'থাম্ থাম্। আজ যে খোকার জন্মবার। ভিকিরিকে ফিরিয়ে দিস না। রাত্তিরের যে রুটিগুলো আছে দিয়ে দে। তরকারিও আছে খানিকটা।

খান দুই রুটি আর একটু ফুলকপির তরকারি জুটে গেল। সামনের বারান্দায় বসে খেল সেটা। কাপড়েই হাত মুখ মুছে ফেলল। একটু জল পেলে হত—সামনের বাড়ির দরজা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে। উঠে হাঁটতে লাগল। অনেক দূর হেঁটে কল পেল একটা, খুলে অনেকখানি জল খেয়ে ফেলল। আবার কিছুদূর হেঁটে পাওয়া গেল ছোট্ট একটা পার্কের মতন। লোহার বেঞ্চিও রয়েছে একটা। সেইখানে গিয়ে বসে রইল। আকাশের দিকে চাইল। আশপাশের বাড়িগুলোর দিকে চাইল। সব পরদা-লাগানো জানলা। যে জানলায় পরদা নেই, সে জানলাটা ফাঁকা। কেউ নেই সেখানে। খাতা পেন্সিল বার করে কবিতা লিখতে শুরু করল সে।

'রান্না-করা কাঁকড়ার লাল লাল ঝালে
কাজুবাদামের নোনতা মিষ্টি স্বাদে
ঘিয়ে ভাজা পেঁয়াজের গন্ধে
হিং-দেওয়া কচুরির ফিং-দেওয়া মাধুর্যে
হাতে টানা রিকশার টুন টুন আওয়াজে
দাঁতভাঙ্গা চিরুনির ফাঁকে ফাঁকে
চুলের জটাপটিতে
দেখতে পাই তোমাকে।
আর আমি—
আমি তখন ব্যাংকের হিসাব মেলাই
যদিও আমার কোন ব্যাংকে হিসেব নেই।
যদিও মোটর নেই
তবু দেখি মোটরে তেল আছে কি না।
স্তূপ মেঘেদের পিছন দিকে
আকাশের যে নীল গলিটা—
অন্যমনস্কতার মেঘে ভেসে ভেসে
সেখানে আস তুমি মাঝে মাঝে।
আমাকে দেখেও দেখ না।
নির্মলদের বাড়ির লোম-ওঠা কুকুরটা
পিঁচুটি-ভরা চোখ দিয়ে
কটাক্ষ হানে আমার দিকে।
ক্ষীণমার্জারীরা আড়-চোখে চায়,
রুজ-পাউডার-মাখা ঘুজঘুজে মেয়েরা
ভঙ্গী করে নানা রকম।
আমার ব্যাংকের হিসাবে গোলমাল হয়
মোটরের ট্যাংকে পেট্রল কমে যায়।
তবু আমি দমি না

না-পাওয়া কাঁকড়ার লাল দাঁড়াটা
চিবোই বসে আনমনে।
আর ভাবি টপসি কার নাম?
কুকুরের, না, মানুষের?
হঠাৎ দেখতে পাই
অন্যমনস্কতার মেঘে চেপে
ভেসে যাচ্ছ তুমি নিরুদ্দেশ যাত্রায়
আমি কি করে যাব?
আমি ভারী, ভাসতে পারি না;
মোটর চড়ি
কিন্তু মোটরে যে তেল নেই।
শুনছ?
কেমন হয়েছে কবিতাটা?'

পাশে কেউ নেই। কল্পনা করছিল সাঁওতাল কিশোরীর মতো লাবণ্যময়ী তার প্রিয়া বসে আছে তার পাশে। নেই। কেউ নেই।

উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াও উঠল একটা। সেই হাওয়াতে উড়তে উড়তে এল একটা কাগজ। উড়তে উড়তে তার দিকেই এল। তুলে নিয়ে দেখল বিখ্যাত দৈনিক কাগজের ছেঁড়া-পাতা একটা। উল্টো পিঠে একজন বিখ্যাত লোকের ছবি। ছবির উপর ময়লা লাগানো। বড় দুঃখ হল। ইচ্ছে হল ওই বিখ্যাত লোকটির ঠিকানা খুঁজে তার পায়ে ধরে গিয়ে ক্ষমা চাইতে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। নাকের পাতা দুটো কাঁপতে লাগল। হঠাৎ সামনের বাড়ি থেকে একটা যণ্ডা লোক বেরুল, তার হাতে চেন-বাঁধা মস্ত একটা কুকুর। অ্যালসেশিয়ান নয়, বুলটেরিয়র। সাদা গায়ের ভিতর থেকে গোলাপী আভা বেরুচ্ছে। কেমন যেন একটা রোখা-রোখা ভাব। ও বুলটেরিয়ার কখনও দেখে নি। অবাক হয়ে চেয়ে রইল। ভয়-ভয়ও করতে লাগল একটু। লোকটা পার্কেই

ঢুকছে। অন্য গেট দিয়ে সরে পড়ল সে। হঠাৎ মনে হল সারা জীবনটাই সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে। বাল্যকাল থেকেই গা বাঁচিয়ে চলছে। মুখে বলেছে—সম্মুখ-সমর। কিন্তু সম্মুখ-সমর দেখে নি কখনও, কোথাও গোলমাল দেখলেই সরে পড়েছে। পার্ক থেকে বেরিয়ে চোখে পড়ল পূব দিকের বাড়ির বাইরের বারান্দাটি দিব্যি চকচকে ঝকঝকে। বোধহয় মোজেইক করা। এগিয়ে গিয়ে দেখল তাই। কারো চকচকে ঝকঝকে জিনিস দেখলেই নেবার লোভ হয়েছে বরাবর। এখনও হল। চারদিকে কেউ নেই। সটান উঠে শুয়ে পড়ল বারান্দাটাতে। মাথায় কাঁথার পুলিন্দাটি দিয়ে বেশ বাগিয়ে শুলো, পাশ ফিরে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। অগাধে ঘুমুতে লাগল। বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল নাচগানের শব্দে। দেখলে, পার্কে একটা ছোঁড়া নানা ভঙ্গী করে নাচছে আর গাইছে—

ওগো আমার মানিনী
নাকছাবিটি আনিনি
কাল আনব, কাল আনব, কাল আনব
মাইরি বলছি কাল নয়তো পরশু
বড় জোর তোরশু
পান্না থাকবে ওতে লো
ওগো আমার ডেসডেমোনা
আমি তোমার ওথেলো।

গান গেয়ে গেয়ে ক্রমাগত নাচতে লাগল ছোড়াটা। আর পয়সা পড়তে লাগল চারদিক থেকে। প্রতিটি বাড়ির জানলায় ভিড়। সবাই পয়সা দিচ্ছে।

কবি দেখতে লাগল দাঁড়িয়ে। আধ ঘণ্টা নেচে একগাদা পয়সা কুড়িয়ে ছেলেটা ঘুরে ঘুরে অভিবাদন করতে করতে চলে গেল। কবি পিছু নিল তার।

'শুনছেন ভাই।'

'আমাকে ডাকছেন ?'

'হ্যাঁ আপনাকে। চমৎকার লাগল আপনার নাচ আর গান: মনে হয় আপনি লেখাপড়াও জানেন—'

'না, আমি মুখ্যু।'

'তাহলে ডেসডেমোনা আর ওথেলোর কথা জানলেন কি করে ?'

'আমি যাত্রাপার্টিতে ছিলাম যে। ওথেলো নাটকটার বাংলা করে আমাদের অধিকারী মশাই নাবাবেন ভেবেছিলেন। ভালো ডেসডেমোনা পাওয়া গেল না। পেঁচামুখী পটলিকে মানালো না। তখনই জেনেছিলাম ওথেলো আব ডেসডেমোনার লভ হয়েছিল।'

'কোন্ যাত্রাপার্টি ?'

'সে দল ভেঙ্গে গেছে। ওই পটলিকে ঘিরেই আগুন জ্বলল। আমি সেখানেই নাচগান শিখেছিলাম তেনা মাস্টারের কাছে। তিনিই তো গানটা লিখে দিয়েছেন।'

'তেনা মাস্টার ? কে তিনি—'

'ভালো নাম ত্রিনয়ন। তেনা তেনা বলে ডাকে সবাই। চমৎকার নাচ শেখায়, ভালো গান বাঁধতে পারে।'

'কোথায় থাকেন তিনি ?'

'চিৎপুরে। একসঙ্গেই থাকি আমরা। ছোট্ট একটা ঘর নিয়েছি তবলার দোকানের উপরে।'

'তাঁর পরিবার নেই বুঝি ?'

'কেউ নেই। আমিই তার পরিবার। সন্ধ্যাবেলা গিয়ে রেঁধে-বেড়ে খাওয়াই।'

'বিয়ে-টিয়ে করেন নি বুঝি ?'

'না। একটি মেয়েমানুষের সঙ্গে ছিলেন। সে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিয়েছে। ঐ রগচটা মেজাজী লোককে সহ্য করবে কে। আমাকে তো প্রায়ই ঠ্যাঙায়। গুণী কিন্তু। শুধু গান-বাজনায় নয়, গুনতেও পারে। ওর সঙ্গে কথা আছে আমি সমস্ত দিন নেচে যে

পয়সা পাব তার অর্ধেক দিতে হবে ওকে। ও ঠিক গুনে বুঝতে পারে আমি কত পয়সা পেয়েছি। একদিন তঞ্চকতা করেছিলাম, মেরে আমার পস্তা উড়িয়ে দিলে।'

কত রোজ পান আপনি।

'তা পাঁচ-ছ'টাকা হয়ে যায়।'

'তেনা মাস্টার আমাকে নাচগান শেখাবেন?'

'অনেক মার খেতে হবে কিন্তু। নাচে ভুল করলেই পায়ে সপাং করে বেত মারবে।'

'উনিই ওই গানটা বেঁধেছেন?'

'হ্যাঁ—'

'ইনি ওর চেয়ে ভালো একটু সভ্যগোছের গান বাঁধতে পারেন না?'

'পারেন। কিন্তু বলেন ওসব গান চলবে না। এদেশে চুটকি ফক্কোড় গান বেশী চলে। বলেন—রেডিওতে বড় ওস্তাদের গান কেউ শোনে না। শোনে বিবিধ ভারতী।'

হি হি করে' হাসতে লাগল ছোঁড়াটা।

'আমাকে নিয়ে যাবেন আপনার তেনা মাস্টারের কাছে? আমিও নাচ শিখব—'

'আপনি ধেড়ে কার্তিক হয়ে গেছেন। নাচ আর আপনার দ্বারা হবে না। তেনা মাস্টার দেখেই আপনাকে দূর করে' দেবে, তাছাড়া আমি আপনাকে নিয়েও যেতে চাই না।'

'কেন?'

'নিজের সতীন আবার কেউ জোটায় নাকি?'

হি হি করে হাসতে লাগল। দাঁতগুলোতে পানের ছোপ ধরেছে। চোখ দুটোতে আলো নাচছে।

আচ্ছা চলি।

কোমরে হাত দিয়ে মাথা নেড়ে আর একটা গান ধরলে ছোকরা।

তন্ মন্ ধন সব দিয়া
তব্ ভি কুছু নেহি পায়া
দিন্ গিয়া রাত গিয়া
তব্ ভি প্যারি নেহি আয়া।

তারপর হঠাৎ একছুটে চলে গেল।

দাঁড়িয়ে রইল ছেলেটা।

'কি হে, তুমি এখানে কি করছ? কে তুমি—'

পাশের বাড়ির দরজা খুলে একটা গোঁফ আর জুলপি-ওলা লোক বেরিয়ে এল।

'আমি এমনি দাঁড়িয়ে আছি।'

'এমনি দাঁড়িয়ে থাকে নাকি কেউ। নিশ্চয় কিছু মতলব আছে তোমার।'

'আমি ভিক্ষা করি—'

'কিছু হবে না এখানে। সরে পড়। জনার্দন যদি এসে পড়ে ঠেঙিয়ে হাড় গুঁড়িয়ে দেবে। এখান থেকে প্রায়ই জিনিসপত্র চুরি যাচ্ছে—'

'আমি এখুনি চলে যাচ্ছি। আমাকে দয়া করে দিন কিছু। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে—'

'কিছু পাবে না যাও—'

'আপনারা তো এখুনি নাচ দেখে ওই ছেলেটাকে কত পয়সা দিলেন—'

'তুমি নাচ দেখাও, তোমাকেও দেব। সোজা নাক দেখানোতে কোনও বাহাদুরি নেই। ঘুরিয়ে নাক দেখালে তবু কিছু আছে ও ছোকরা ঘুরিয়ে নাক দেখাল, তুমি সোজা নাক দেখাচ্ছ। সরে পড় এখান থেকে—'

দড়াম করে কপাটটা বন্ধ করে দিলে সে। ছোঁড়া আবার

হাঁটতে লাগল। কিছু দূর গিয়ে দেখল একটা সরু গলির মোড়ে প্রকাণ্ড একটা লাল বাড়ি। রাস্তার দিকে বেশ বড় একটা বারান্দা। বাড়িতে সে ঢুকতে পারে না, কিন্তু বারান্দায় বসতে পারে। বারান্দার ওধারে একটা রাস্তার কুকুরও কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। এধারে গিয়ে বসল সে। খুব ক্ষিধে পেয়েছিল। হঠাৎ পিছনের জানলাটা খুলে গেল। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল, একটি প্রৌঢ়া মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। তার মনে হল একটি মাতৃমূর্তি যেন দাঁড়িয়ে আছে।

করুণ দৃষ্টি তুলে তাঁর দিকে চাইতেই তিনি বললেন—'কে তুমি বাবা?'

'আমি ভিকিরি মা। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, অনেকক্ষণ কিছু খাই নি—'

'তোমার গায়ের কাপড় জামাও তো খুব ময়লা। তুমি ভিকিরি হ'লে কি করে? তোমার বাবা মা নেই—'

'না। মামার বাড়িতে থাকতুম। সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি।'

'কেন?'

ছোঁড়াটা চুপ করে রইল মাথা হেঁট করে। কারণ এ 'কেন'র উত্তর দেওয়া সহজ নয়।

'তুমি দাঁড়াও একটু।'

মহিলা অন্তর্ধান করলেন। তার একটু পরেই একটি চাকর এসে সদর দরজা খুলল।

'এই নাও।'

একটি মাটির সরায় কিছু খিচুড়ি। একটা সন্দেশ। তাছাড়া ভাজা কয়েক রকম।

'এত খাবার আমাকে দিলেন?'

'হ্যাঁ। কাল সরস্বতী পুজো ছিল। তারই ভোগ।'

চাকরটির কাঁধে একটি খদ্দরের কোট আর ফরসা কাপড়ও ছিল একখানা।

'এগুলোও তোমাকে দিয়েছেন মা।'

একটু হকচকিয়ে গেল ছেলেটা। তারপর খাবারের সরাটা নিয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে লাগল। দেখল খিচুড়ি, তরকারি, সন্দেশ—সব বরফের মতো ঠাণ্ডা। বোধহয় 'ফ্রিজে' ছিল। তার মানে এরা বড়লোক। প্রচণ্ড বড়লোক। এত বড় বাড়ি, বাড়িতে পূজো হয়। বাড়িতে 'ফ্রিজ' আছে। তার সঙ্গে এক বন্ধু পড়ত—তার নাম দিব্যেন্দু দাস। সে বলত—দেখ্, এটা জানবি বড়লোক মাত্রেই আমাদের শত্রু। ওদের ধ্বংস করলে আমাদের মুক্তি। দিব্যেন্দু তিনবার ফেল করে ম্যাট্রিক পাস করেছিল। বলত্—একজামিনাররা বড়লোকের ছেলেদের পাস করিয়ে দেয়—আর গরীব ছেলেদের ফেল করায়। ইচ্ছে করে করায়। দিব্যেন্দু কোনও ক্লাসেই নাকি একবারে প্রমোশন পায় নি। তার সঙ্গে আই-এ পড়ত। ফেল করেছিল। সে যে অপদার্থ এ কথা কিন্তু একবারও স্বীকার করত না সে। বলত—তলে তলে—হুঁ হুঁ—অনেক ব্যাপার আছে ভাই। আমি যে গরীব। দিব্যেন্দুর কথা শুনে শুনে তারও মনে এই ধারণাটা গেঁথে গিয়েছিল যে বড়লোক মাত্রেই পাজী, গরীবরা সব ভালো। এখন কিন্তু এই ক্ষিধের মুখে খাবার পেয়ে তার ধারণাটার রং বদলে গেল হঠাৎ। মনে হল, না, সব বড়লাকেরা খারাপ তো নয়। আমাকে উনি খাবার জামা কাপড় না দিলেও তো পারতেন! যারা আমাকে তাড়িয়ে দিলে তাদের মধ্যে গরীবও তো অনেক ছিল।

খেয়ে রাস্তার কলে জল খেয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল সে। মনের ভিতর কিন্তু জুলফিওলা সেই লোকটার কথাগুলো জাগতে লাগল। ঘুরিয়ে নাক দেখালে বাহবা দেয় সবাই।...বড় রাস্তায় সে পড়েছিল। দেখল সারি সারি গাড়ি চলছে, প্রত্যেক গাড়িতে তুলোর বস্তা। গাড়িগুলো পার হল তো এল লরির সারি। এতেও সারি

সারি বোরা। তেরপল দিয়ে ঢাকা। লরিগুলো চলে যাবার পর সে রাস্তা পার হয়ে ওপারে ফুটপাতে গিয়ে পড়ল। সেখানে একটি ইলেকট্রিসিটির থাম ছিল। তার নীচে একটা মুচি বসে জুতো সেলাই করছিল। থামের ও-পাশটা খালি ছিল। সেইখানেই গিয়ে বসে পড়ল সে। পকেট থেকে বার করল খাতা আর পেন্সিল। কবিতা লিখতে হবে। সেই ঘুরিয়ে নাক দেখাবার কথাটাই মনে জাগছিল। শুরু করে দিলে—

সোজা নাক দেখালে
বাহবা দেয় না কেউ
ঘুরিয়ে নাক দেখালে বলে--চমৎকার।
মন কেমন করছে বললে
সবাই বলে সেকেলে
বলতে হয় পাংশু মনের কুট্‌কুটুনি জ্বালাচ্ছে।
শুধু সবুজ বললে কান দেয় না কেউ।
উৎকর্ণ হয়ে ওঠে শ্যাওলা-সবুজ বললে,
পান্না-সবুজ বাতিল হয়ে গেছে আজকাল।
ঠিক করেছি তাই
ভাইকে বলব বাবার ছেলে
স্ত্রীকে শালার দিদি।
আর শ্বশুরকে শালীর দাদার বাবা।
বাবাকে পিসেমশায়ের বড় শালা।
এই সব হিসেব করছি
ক্রমাগত হিসেব করছি
হিসেবই করে যাচ্ছি
এমন সময় লাথি খেলাম,
মনে হল ঘোড়ার লাথি
পড়ে গেলাম মুখ থুবড়ে।

উঠে দেখি ঘোড়া নেই
কেউ নেই
আমার দিকে কটমটিয়ে চেয়ে আছে
আমার মাত্রাবোধ।
আর তার পাশে তুমি।
লজ্জিত হলাম।

সে হয়তো আরও লিখত। কারণ লেখার একটা ঝোঁক এসে গিয়েছিল তার। কিন্তু হঠাৎ বাধা পড়ল। নীল রঙের প্রকাণ্ড একটা ধামা এসে ধাক্কা মারল তাকে। তার পর সে আবিষ্কার করল ধামা নয় পাছা। তার ঠিক পাশেই পেন্টালুন পরা একটা মেয়ে হেঁট হয়ে কি যেন কুড়াচ্ছে রাস্তা থেকে। তার রঙ্গীন লজেন্সগুলো পড়ে গেছে ফুটপাতের উপর।

মণি থাম না একটু ভাই লজেন্সগুলো পড়ে গেছে। 'শো' সাড়ে পাঁচটায় শুরু হবে। এখনও অনেক দেরি।

হিপি-মার্কা মণি একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। সে আকর্ণ বিশ্রান্ত হাসি হেসে বলল—তার আগে চীনে রেস্তোরাঁয় যাব। চীনে মাল খাওয়াব তোকে আজ। সেখানে শ্লারা আমরা শিরি ফরহাদ বনে যাব একেবারে—বুঝলি—

সব 'স' গুলোই সংস্কৃত দন্ত্য 'স' উচ্চারণ করলে।

'এই ট্যাকসি—'

ট্যাকসি দাঁড়াতেই উঠে পড়ল তারা। বোঁ ক'রে চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল তার প্রিয়া। তার মানসী। সে যেন একটু আগে এসে বসেছিল তার পাশে। তার নানারকম চেহারা কল্পনা করে সে। কিন্তু বিভিন্ন চেহারার ভিতর তার প্রিয়া প্রিয়াই থাকে, অপ্রিয়া হয় না কখনও। তার প্রিয়া পেলব শোভন মধুর অবর্ণনীয়া। এই মেয়েটাকে দেখে সে লজ্জায় মরে গেল। নিশ্চিহ্ন

হয়ে গেল তার পাশ থেকে।

হঠাৎ আবার একটা হৈ হৈ উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে একটা মোষের গাড়ির একটা মোষ খুলে গিয়ে দৌড়চ্ছে, একটা ছুটন্ত ট্যাকসির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল সেটা। ট্যাকসিটাও থেমে গেল, লোকে লোকারণ্য। আবার দাঁড়িয়ে গেল মোটরের সারি। দেখতে পেল একটা ফুল দিয়ে সাজানো মোটর থেকে চেলিপরা একটি সুন্দর বৌ রক্তাক্ত মোষটার দিকে চেয়ে আছে।

আরও ভিড় জমতে লাগল। ভিড় বেশীক্ষণ ভালো লাগে না। আবার হাঁটতে লাগল সে। হাঁটতে লাগল। ক্রমাগত হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে একটা আশ্চর্য প্রশ্ন মনে জাগল—কেন আমি হাঁটছি? কেন আমি মামার বাড়ি থেকে পালিয়ে এলাম? কি চাই আমি? কি খুঁজছি? চাকরি? চাকরি পেলেই কি আমি সুখী হব? মজুমদার মশাই বড় চাকরি করেন, কিন্তু তিনি কি সুখী? প্রায়ই তার মামার কাছে এসে হাউ হাউ করে কাঁদতেন। সুখী হলে কেউ অমন করে কাঁদে? এই সব আশ্চর্য প্রশ্নের একটা আশ্চর্য উত্তরও যেন আবছাভাবে মনে এল তার। তার মনে হল সে যেন নিজেকেই খুঁজছে, নিজেকেই সে যেন হারিয়ে ফেলেছে ভিড়ের ভিতর, নিজেকে খুঁজে পেলেই যেন আপাতত বর্তে যাবে সে।

জ্ঞানীরা 'আত্মানং বিদ্ধি' বলে চড়া সুরে উপদেশ দেন, সেই সুরে উদ্বুদ্ধ হয়ে ও নিজেকে খুঁজছিল না, ওর মনে হচ্ছিল ওর নিতান্ত 'আপনজন' যেন কোথায় হারিয়ে গেছে, তাকে পেলেই বুঝি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সে আপন জনের স্বরূপ কি? তা-ও জানা ছিল না তার। জানা ছিল না, তবু খুঁজছিল। এই ভিড়ে তাকে খুঁজে পাওয়া কি সম্ভব? তারপর হঠাৎ মনে হল তার প্রিয়ার কথা যে প্রিয়াকে কখনও দেখেনি কখনও দেখবে না, তার কথা। মনে হল তাকে পাই বা না পাই, সে বড় ভালো বড় সুন্দর, এই মরুভূমিতে সেই মরূদ্যান, সেখানে সবুজ আছে ফুল আছে ঠাণ্ডা জল

আছে।

হঠাৎ তার মনে হল তাকে পাব কি? সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, না পাব না। তার তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে এই রূঢ় উত্তরটা দিলে। কিন্তু তার অন্তরের অন্তস্তলে কল্পনার যে ফল্গুধারা বইছিল তার তীরে বসেছিল কে একজন। সে বললে—পাবে পাবে নিশ্চয় পাবে।

কিছু দূর হেঁটে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। দেখলে একটা রোগা চিনেম্যানকে একটা কুচকুচে কালো মেয়ে জল খাওয়াচ্ছে। জল ঢেলে দিচ্ছে একটা সুদৃশ্য মগ থেকে। চিনেম্যানটা অঞ্জলি পেতে অঞ্জলিতে মুখ লাগিয়েই জল খাচ্ছে। কলকাতা শহরের রাস্তায় কিছুই বিসদৃশ নয়, কিন্তু এ দৃশ্যটা ভারি অদ্ভুত মনে হল তার। কে ওই কালো মেয়েটা? ওর নাম নিশ্চয় শ্রাবণী! মূর্তি-মতী শ্রাবণ যেন। চিনেম্যানটার সঙ্গে ওর সম্পর্ক কি? হঠাৎ এক পাল ছাগল আর ভেড়া এসে পড়ল। ফুটপাথেও উঠে পড়ল তারা। রাস্তায় তখন মোটরের ভিড় ছিল না। ভিক্টোরিয়া গাড়ি একটা দাঁড়িয়ে ছিল মোড়ের দিকে আর টুং টুং করে চলেছিল একটা রিক্সা। সবাই কিন্তু অভিভূত হয়ে পড়ল এই ছাগলদের ভিড়ে। ভিক্টোরিয়া গাড়ির ঘোড়াটা কান খাড়া করে হ্রেষাধ্বনি করে উঠল একবার। কিন্তু তা গ্রাহ্য না করে কশাইখানার যাত্রী সব দ্রুতবেগে ছুটে চলতে লাগল মৃত্যুর দিকে।

হাঁটতে লাগল আবার। এটা কোন্ পাড়া? কোন্ রাস্তা? এ সব নিয়ে মাথা ঘামাল না সে আর। দু একটা রাস্তা ছাড়া সব রাস্তাই এক রঙা। অন্যমনস্ক হয়ে যেতে হোঁচট খেল এক জায়গায়। স্তূপাকার বাঁধাকপি ফুটপাতের উপর। পাশেই একটা বাঙালী মিষ্টির দোকান—Haru's Sweets। বাঙ্গালীরা পারতপক্ষে বাংলায় দোকানের নাম লেখে না। হঠাৎ মনে হল কথাটা। পরমুহূর্তেই কিন্তু ভুলে গেল আর একটা লোকের ধাক্কা খেয়ে। তারপরই খানিকটা ফাঁকা ফুটপাথ। তার পরই একটা ছোট্ট পার্ক।

পার্কে গিয়ে ঢুকল সে। ঢুকে বসে পড়ল একটা বেঞ্চির উপর। আহ্! বড্ড পা ব্যথা করছিল। অনেকক্ষণ বসে র'ল চুপ করে। তারপর খদ্দরের জামা আর কাপড়টা দেখলে। দুটাই বেশ ভাল। কিন্তু কাপড়জামা বদলাবে কোথায়! রাতে কোথাও বদলাতে হবে। আর একটা কথাও মনে হল। এই কাপড়জামা পরে ভিক্ষা করা চলবে কি? ফরসা কাপড়জামা দেখে লোকের দয়ার উদ্রেক হবে কি? দয়ার বা বিরক্তির? বিরক্ত হয়েই লোকে দু-এক পয়সা ভিক্ষে দেয় সাধারণত। সামনের একটা ইলেকট্রিক তারের উপর কাক বসে ছিল একটা। তার পাশে আর একটা কাক উড়ে এসে বসল। বসেই হাঁ করল, আর প্রথম কাকটা তার মুখে ঠোঁট ঢুকিয়ে খাবার খাইয়ে দিলে। ওর মা নিশ্চয়। একটা ছেলে গুলতি দিয়ে টিপ করছিল ওদের। ওরা সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল।

পার্কে অনেকক্ষণ কেউ এল না। তারপর এলো একটা কুৎসিত কালো লম্বা মেয়ে। তার কাঁধে একটা লম্বা থলি। সে আনমনে কাগজ কুড়িয়ে সেই থলিতে ভরতে লাগল। তারপর চলে গেল। তার দিকে একবার ফিরেও চাইল না। আকাশের দিকে চেয়ে দেখল একটা চিল চক্কোর দিচ্ছে। চিল না শকুনি? ঠাহর করতে পারল না ঠিক। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল সেই রোগা চিনেম্যানটাকে। বার করল কবিতার খাতা—

অনেকদিন পরে টুংলিং এল।
বুঝতে পারলাম না
সে মানুষ না দিগন্ত পারের হাতছানি।
এসে বললে, তেষ্টা পেয়েছে
বড্ড পিপাসিত আমি
ওগো বাঙ্গালী বাবু
আমার পিপাসা মেটাও।
ভদ্‌কা শ্যামপেন বারগাণ্ডি রম কোঁইয়াক্

অনেক খেয়েছি : পিপাসা মেটেনি।
নিয়ে গেলাম তাকে শ্রাবণীর কাছে
যার নিতল চোখের অতলতায়
ডুবে গেছে বড় বড় মানোয়ারি-জাহাজ।
সে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ
চোখের পাতা দুটো কাঁপল একটু।
তারপর বাঁশী বেজে উঠল
তার উদ্ভাসিত চোখে মুখে।
সে বাঁশী বলল, তুমি
শত্রুর মুখোস পরে আছ
কিন্তু তুমি শত্রু নও।
তোমার পিপাসা মেটাব আমি।
আমি ভারতবর্ষ।
আগেও তোমার পিপাসা মিটিয়েছিলাম।

হঠাৎ তার মনে পড়ল চীন-আক্রমণের কথা। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল আমাদের দেশেই আমাদেরই আপন লোকেরা কি প্রতিদিন আক্রমণ করছে না আমাদের? পাড়ায় পাড়ায় কেন ঘরে ঘরেই কোন্দল জুয়াচুরি ধাপ্পাবাজি খুন জখম দলাদলি তো খবরের কাগজের প্রধান খবর এদেশে। এরই ঘূর্ণাবর্তে তো আবর্তিত হচ্ছি আমরা, চোরেরা চুরি করছে আর ভদ্রলোকেরা মারা যাচ্ছে। হঠাৎ তার মনে হল—কিন্তু না, আমি এ চাই না। আমি জানি এ থাকবে না। চাবুকে জর্জরিত হয়েছে, কিন্তু চাবুক থেমে যাবে। আমি চাই —হঠাৎ সে গুলিয়ে ফেলল সব। কি চায় সে? নিজেই জানে না। তার মনে হল অবাস্তব চাওয়াটা বাস্তব হবে না কখনও। তা উচ্চারণ করলে হো হো করে হেসে উঠবে সবাই, কিন্তু তবু আশা ছাড়তে পারে না সে। আর একটা কবিতা লিখে ফেললে সে—

কেমন যেন গুটিয়ে যায় সব

আসে, খুব কাছে আসে—
কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাল-গোল পাকিয়ে যায় যেন।
নিয়তি, ভগবান, কর্মফল, অদৃষ্ট।
এদের মানলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম।
কিন্তু মানি না, মানতে পারি না।
বুদ্ধি রাশ টেনে ধরে।
তাই সাজগোজ করি শুধু
তারপর দিক্‌বিদিক্‌-জ্ঞান-শূন্য হয়ে
ঝাঁপিয়ে পড়ি চিন্তার সমুদ্রে।
নাকানি চোবানি খাই
তবু মনে হয়
এই সমুদ্র থেকে হয়তো উর্বশী উঠবে
এই দুধ থেকেই মাখন।
এ আশা ছাড়িনি এখনও
তাই আকাশ নীল
সূর্য জ্বলন্ত
তুমি অপরূপ।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে তার 'তুমি' নেই। কিন্তু আর একজন বসে আছে বেঞ্চের ও-প্রান্তে। চ্যোং-প্যান্ট পরা দাড়িওলা একটা ছেলে। গায়ে একটা আধুনিক বুশ-শার্ট। চোখে চশমা। গলায় একটা বাইনাকুলার। কবিতা-লেখায় মগ্ন ছিল বলে' বুঝতে পারেনি এই অদ্ভুত লোকটি কখন এসে বসেছে। হাঁ করে চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর চোখাচোখি হতেই নমস্কার করলে। সে ছেলেটিও নমস্কার করে হাসলে একটু।

'আপনার গলায় ওটা কি?'

'বাইনাকুলার।'

'কি করেন ওটা দিয়ে?'

'পাখি দেখি।'

'পাখী দেখেন? কেন?'

'আর কিছু করবার নেই বলে।'

'তার মানে?'

'তার মানে আমি বেকার। কেরানীগিরি করবার সুযোগ পাইনি।'

ছোঁড়াটা হেসে বলল—'আমিও—'

'কি করেন আপনি?'

'রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই আর ভিক্ষে করি।'

দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর সেই লোকটা বলল—'চলুন তাহলে যাওয়া যাক—'

চলতে লাগল দুজনে। হঠাৎ দাড়িওলা বলল, 'আমি হিন্দু।'

'কোথা যাচ্ছি আমরা?'

'বিশেষ কোন ঠিকানা নেই। বিন্নুর কথায় এখানে ভুল জায়গায় এসে পড়ছিলাম। সে বলে দিল এই পার্কে নাকি কুলো পাখী দেখা যাবে। কিন্তু এখানে এসেই বুঝলাম যাবে না। এ তো তকমা-আঁটা সভ্য-ভব্য পাড়া, এখানে কি ওই গেঁয়ো পাখী থাকতে পারে? তিনতলায় জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলাম কে একজন খাঁচায় কয়েকটা মুনিয়া পুষেছে। আহা মুনিয়ার ঝাঁক একবার দেখেছিলাম ভাগলপুরে স্যানাডিস কম্পাউণ্ডে। মাঠের খানিকটা হঠাৎ যেন উড়ে গেল আকাশে। এখানকার মাঠে জোড়া জোড়া ঘুঘু বসে আছে, মানে প্রেমিক ঘুঘু। দূরে নানা রঙের "নিয়ন" আলো জ্বলছে, আর মোটরের হর্ন শোনা যাচ্ছে। রাবিশ্, আসুন, এই ট্রামটায় ওঠা যাক—'

ছোঁড়াটা বললে "আমার পয়সা নেই—"

'আপনি আসুন না। আমিই আপনার টিকিট কাটব। উঠে পড়ুন।'

উঠে পাশাপাশি একটা বেঞ্চে বসে দাড়িওলা ছেলেটা বললে -- 'সিগারেট খান?'

না—

'আমি কিন্তু খাই। কিন্তু ট্রামে খেলে আপত্তি করবে সবাই। তাই এখন খাব না। এইটে মুখে ফেলে দিই। এসপ্ল্যানেডে নেবে সিগারেট ধরাব।'

একটা বড়ি মুখে ফেলে দিলে ছোকরা।

কি খেলেন ওটা—'

'নেশার বড়ি। খাবেন?'

'না। খেতেই পাই না, নেশা করাব পয়সা পাব কোথা—'

'কোন নেশা নেই আপনার?'

'আছে। কবিতা লিখি মাঝে মাঝে—'

'ও তাই নাকি। তাহলে তো আপনি গুণী লোক মশাই। চলুন আমার বাড়ি—বাড়ি মানে হোটেল। আপাতত একটা হোটেলে থাকি। বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে। পাক সেনার অত্যাচারে পালিয়ে এসেছি। বিনোদ আমাকে এই হোটেলটা ঠিক করে দিয়েছে। বিনোদ আমার সহপাঠী। দুজনেই আমরা প্রেসিডেন্সিতে পড়েছি। ঢাকায় আমাদের বাড়ি। পরীক্ষা পাস করে সেখানেই গিয়েছিলাম চাকরির চেষ্টায়। এমন সময় যুদ্ধ বেধে গেল। আমার বাবা-মাকে মেরে ফেললে ওরা, সে দানবীয় অত্যাচার বর্ণনা করা যায় না। গা শিউরে ওঠে। কিন্তু সব মুসলমানরাই খারাপ নয়। কাশেম বলে এক মুসলমানের সাহায্যে আমি আর আমার বোন তামা পালাতে পেরেছিলাম। কাশেম আমাদের বাড়ির সহিস ছিল। ঘোড়া ছিল আমাদের। সেই ঘোড়া করে মাঠামাঠি ঘুরপথ দিয়ে কাশেম আমাদের পার করে দিয়েছিল। এখন হোটেলে আছি—'

ছোঁড়াটা বললে—'হোটেলে থাকতে তো পয়সা লাগে—'

'আমার পয়সা আছে আপাতত। আমার বাবা একটা ভালো কাজ করেছিলেন। কিছুদিন আগে তিনি এখানকার একটা ব্যাংকে আমার নামে অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন। তাঁর ভয় হয়েছিল ওদেশে

হয়তো আর থাকা যাবে না। বাড়িটা বিক্রি করতে পারেননি। নগদ টাকা সব তুলে এনে জমা করেছিলেন আমার নামে। ভাগ্যে আমার নামে করেছিলেন তা না হলে'—হঠাৎ চুপ করে গেল সে। তারপর আর একটা বড়ি মুখে ফেলে চুপ করে বসে রইল। অন্য-মনস্ক হয়ে গেল কেমন যেন। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।

'একটা চিল বসে' আছে—দেখে আসি ওর ল্যাজটা—'

ছোঁড়াটাও নেবে পড়ল তার সঙ্গে।

গড়ের মাঠ। অনেক দূরে একটা ইলেকট্রিক থামের উপর বসে ছিল চিলটা।

'আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি দেখে আসি। আর আপনার যদি কৌতূহল থাকে আপনিও আসুন।'

'নাঃ, আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি, আপনি দেখে আসুন।'

একটা স্টলের কাছে দাঁড়িয়ে রইল সে। একটি কথাই মনে হতে লাগল—পাকসেনারা ওর বাবা ও মাকে হত্যা করেছে। ও এখন নেশা করবার জন্য কি একটা বড়ি চুষছে। আর পাখী দেখে বেড়াচ্ছে। চিলের ল্যাজ—তাতে দেখার কি আছে?

পাশে চেয়ে দেখল খবরের কাগজের স্টল একটা। নানা রকম রঙীন মলাটের পত্রিকা। আর প্রায় প্রত্যেক পত্রিকার উপরই নানা ভঙ্গীতে মেয়েমানুষের ছবি। লালসা-জাগানো ছবি। ওপাশে একটা লোক ফল বিক্রি করছে। চমৎকার কলা রয়েছে। কলা তার খুব প্রিয়। কত দিন যে কলা খাইনি—হঠাৎ মনে হল তার। হঠাৎ কয়েকজন বলিষ্ঠ পাঞ্জাবী ড্রাইভার হো হো করে হাসতে হাসতে ওপাশে দাঁড়ানো লরিগুলোর দিকে চলে গেল। একটা অর্ধ-উলঙ্গ ফিরিঙ্গি মেয়ে খট খট করে চলে গেল সামনে দিয়ে। চুল বব্ করা। পরনের স্কার্ট উরুর অর্ধেকও ঢাকতে পারেনি। খটখট করে একটা বাসে উঠল তারপর জানলা দিয়ে হাত নাড়তে লাগল। কাকে সম্ভাষণ করছে ভিড়ের মধ্যে ঠিক বোঝা গেল না। একটা দামী

মোটর এসে দাঁড়াল। মোটরের জানলায় একটি তরুণীর মুখ। মনে হল যেন স্বয়ং লক্ষ্মী। সমস্ত দিন খাই নি মা—দয়া করে কিছু দিন। মেয়েটি ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা টাকা দিয়ে দিল তাকে। অবাক কাণ্ড।

হ্যাঁ সত্যি একটা টাকা। সঙ্গে সঙ্গে সে দুটো কলা কিনে ফেলল। ভালো মর্তমান কলা। দুটোর দাম নিল—তিরিশ নয়া। কলা খাওয়া শেষ করেছে এমন সময় সেই দাড়িওলা ছোকরা ফিরে এল।

'চিলের ল্যাজ দেখলেন ?'

'না। উড়ে গেল। আশ্চর্য ওর ল্যাজ! মনে হয় কতকগুলো ছুরি যেন সাজানো আছে। যখন ওড়ে তখন সেগুলো দুদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মনে হয় ল্যাজটা বুঝি চেরা। ফিঙে পাখীর ল্যাজে দুটো বাঁকা ছোরা আছে। চিলেরও অনেকগুলো। পাখীর ল্যাজ একটা আশ্চর্য জিনিস। দোয়েল আর দর্জি পাখীর ল্যাজ তোলা দেখে বোঝা যায় ওদের তেরিয়া ভাব, খঞ্জনের ল্যাজ দোলানো যেন ওদের সদা-চঞ্চল সদা-ব্যস্ত স্বভাবের পরিচয় দিচ্ছে, কাজল পাখী আস্তে আস্তে ল্যাজ দোলায়, মনে হয় যেন ও একটু হিসেবী, থিরথিরা পাখীর ল্যাজ দোলানো চমৎকার, উপর-নীচ নয়, পাশাপাশি তার সঙ্গে একটু নমস্কার করার ভঙ্গীও আছে, বুলবুলির ল্যাজের তলায় আগুন—টকটকে লাল। ময়ূরের ল্যাজ তো দেখেছেন, তাকে আমরা পেখম বলি, কুলো পাখীও ওই রকম পেখম তুলে নাচে, যার খোঁজে আজ গিয়েছিলাম—কিন্তু—'

ছোকরা থেমে গেল হঠাৎ। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

'কিন্তু কি—'

'মাকে মনে পড়ছে। মায়ের একটা টিয়া ছিল। অদ্ভুত ছিল তার লেজ। সবুজে, নীলে হলুদের আভায় সে যেন একটা রঙের ঝর্ণা। মা পাখী ভালবাসত। কাক চড়ুই শালিক সবাইকে খেতে দিত—'

আবার চুপ করে গেল। তারপর হঠাৎ আবার বলে উঠল— 'জানেন আমার সেই মাকে ওরা খুন করেছে। খুন করবার আগে

সতীত্ব হরণ করেছে, তারপর গুলি করেছে—আমার মা কারও কোনও অনিষ্ট করেনি—ওরা—' হঠাৎ থেমে গেল আবার।

'চলুন যাই। হোটেল কাছেই—'

রাস্তা পার হওয়া সহজ নয়। মোটর গাড়ির সারি চলেছে। মানুষ অসংখ্য। সবাই ছুটছে। ছোঁড়াটার মনে হল কে যেন ওদের চাবুক নিয়ে তাড়া করছে। প্রাণভয়ে পালাচ্ছে সবাই। একটা ফেরিওয়ালা কিন্তু নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ধারে—হাতে একটা বাঁশ, তাতে অসংখ্য রঙীন বেলুন। ওপাশে সারি সারি রিক্‌শা। পরমুহূর্তেই হাঁ হাঁ করে উঠল সবাই—একটা ছোট ছেলে ছিটকে গিয়ে পড়েছে রাস্তার মাঝখানে। তার মা তাকে ধরবার জন্যে আলুথালু বেশে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভিড়ের ভিতর। দেখে মনে হল বিহারিণী। নাকে প্রকাণ্ড একটা নথ। মাথায় এক ধ্যাবড়া সিঁদুর।

হোটেলটি অভিজাত হোটেল। তারই দোতলায় দুটি ঘর নিয়েছে দাড়িওয়ালা ছোকরা। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে দাড়িওয়ালা ছোকরা হঠাৎ জিগ্যেস করল—'আপনার নামটা জিগ্যেস করা হয়নি। আমার নাম সাতকড়ি। আপনার?'

'আমার নাম সত্যেন। সত্যেন ভদ্র।'

'ডাক নাম সাতু কি?'

'হ্যাঁ—'

'আমারও ডাক নাম সাতু। অদ্ভুত মিল হয়ে গেল। বাঃ—'

ছোঁড়াটা অবাক হয়ে যাচ্ছিল। আরব্য উপন্যাসে আবু হোসেনের গল্প পড়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে সেই গল্পেরই পুনরাবৃত্তি ঘটছে না কি! এমন একটা অভিজাত হোটেলে সে যে প্রবেশ করতে পারবে তা একটু আগেও কল্পনার অতীত ছিল।

হঠাৎ কপাটটা খুলে একটি শেমিজপরা মেয়ে দেখা দিয়েই অন্তর্ধান করল নিমেষে।

সাতকড়ি নিম্নকণ্ঠে বলল—'তামা—'

তারপর চেঁচিয়ে বলিল—'ও তামাম্, নতুন বন্ধু পেয়েছি।'

ঘরে ঢুকে কাউকে দেখতে পেল না সে। সোফা-সেটি দিয়ে সাজানো ঘর। একপাশে একটা ছোট ডিভান রয়েছে। ডিভানের উপর অনেক বাংলা ইংরেজি বই। ' ডিভানের পাশেই একজোড়া লাল স্যাণ্ডাল।

'তামা কোথা গেলে, কে এসেছে দেখ—'

শেমিজের উপর একটি লম্বা কোট গায়ে দিয়ে একটি মেয়ে কপাট খুলে ঘরে ঢুকল। ঢুকে নমস্কার করল।

সাতকড়ি বললে—'এঁর সঙ্গে রাস্তায় হঠাৎ দেখা। কুলো পাখী খুঁজতে গিয়ে এঁকে পেলাম। এঁর দুটি মহৎ পরিচয়। প্রথম—ইনি আমাদের মতো বেকার, দ্বিতীয়ত উনি কবি।'

তারপর ছোঁড়াটার দিকে ফিরে বলল—'এঁর নাম তামা। পুরো নাম নূরতামাম। আমি সেটা ছোট করে নিয়েছি। আমার বাবার বন্ধু জাফর আলির মেয়ে ও। ওর বাড়িরও কেউ বেঁচে নেই। ওর বাবাকে আমরা জেঠু বলতাম। সুতরাং তামা আমার বোন। আপনাকে আমরা কি বলে ডাকব? মিতা, না স্যাঙাৎ?'

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ছোঁড়াটা। তার মনে হচ্ছিল এদের বাড়ির সবাইকে খুন করেছে বর্বর পাক সেনারা। অথচ এরা কত সহজভাবে কথা বলছে।

'চুপ করে আছেন কেন? ভাব করুন তামার সঙ্গে। ও খুব সাহিত্য-রসিক। বাংলায় অনার্স নিয়ে বি-এ পাস করেছে। কবিতা খুব ভালবাসে—'

ছোঁড়াটা চেয়ে দেখল তামার চোখ দুটো প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। নাকের ডগাটা ঈষৎ কাঁপছে যেন। হঠাৎ সে আশ্চর্য হয়ে গেল তার গায়ের রং দেখে। রংটাও যেন তামার মতো। লালচে অথচ উজ্জ্বল। মনে হল কি একটা বইয়ে যেন রেড ইণ্ডিয়ান যুবতীর ছবি দেখেছিল

অনেকদিন আগে, তার গায়ের রং আর তামার গায়ের রং যেন এক। উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ। কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়ল সে।

অপ্রত্যাশিতভাবে তামা কথা বলল।

'আপনাকে আমরা অতিথি বলে ডাকব। কখনও সেটা হবে "অতি" কখনও "তিথি"। নতুন রকম হল। রাজি?'

ছোঁড়াটা তবুও নির্বাক হয়ে রইল। কোনও কথাই সরছিল না তার মুখ দিয়ে। তার কেবলই মনে হচ্ছিল এদের জন্যে আমি কিছুই করিনি তো।

তামা আবার ভিতরে চলে গেল।

'বসুন দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? চটপট ঘরের লোক হয়ে যান। তামা, খিদে পেয়েছে।'

তামা আবার বেরিয়ে এল।

বললে—'সন্দেশ কিন্তু একটি আছে। সেটি অতিথিকে দেব। ডিম আছে, ডিমের অমলেট বানিয়ে দিচ্ছি। চা খাবেন, না কফি—'

ছোঁড়াটা তখন বলল—'যা দেবেন তাই খাব, খুব ক্ষিধে পেয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে—আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করবার আগে আমার পরিচয় আপনাদের জানানো উচিত—'

হো হো করে হেসে উঠল সাতকড়ি। তামার চোখে-মুখেও একটা হাসির আভা ঝলমল করতে লাগল।

ছোঁড়াটা বলল—'আমি ভিখারী। রাস্তার সাধারণ নগণ্য ভিখারী আমি—'

তামা বলল—'আমরাও ভিখারী—ভিখারী তো কি হয়েছে? যতক্ষণ সাতুর ব্যাংক ব্যালান্স "নিল" না হবে ততক্ষণ আমরা চালিয়ে যাব। আসুন ও-ঘরে। ইলেকট্রিক স্টোভ আছে তারই পাশে বসবেন। মেজেতে বসেই খাওয়া-দাওয়া করি আমরা। আসুন—'

খেতে খেতে সাতু বলল, 'খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা দুজনেই কিন্তু বেরিয়ে যাব! দুজনেরই ইনটারভিউ আছে দু' জায়গায়।

আপনি কি থাকবেন এখানে ?'

অবাক হয়ে গেল সত্যেন।

বলল—'আমাকে তো আপনারা চেনেন না। আমাকে বিশ্বাস করে' বাড়িতে রেখে যাবেন ?'

তামা একগাল হেসে বলল—'যাব। আপনি যদি আমাদের জিনিসপত্তর চুরি করে' নিয়ে যান, তাহলে কি যে মজা হবে! সাতু আবার সব নতুন জিনিস কিনে দেবে। দেবে না সাতু ?'

'নিশ্চয় দেব। কিন্তু উনি জিনিস চুরি করে' পালাবেন না।'

দু' কাপ চা, চার টুকরো মাখনদেওয়া পাঁউরুটি, দুটি ডিমের অমলেট এবং একটি সন্দেশ খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়েছিল সত্যেনের। তখনি সে যেন বুঝতে পেরেছিল এ কয়দিন সে প্রায় অনাহারেই ছিল। খেয়ে ঘুম পাচ্ছিল তার। বলল—'আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি এখানে একটু ঘুমুই। আপনারা এলে তারপর চলে যাব।'

'চলে যাবেন কেন ?'

সাতু জিগ্যেস করল।

চুপ করে রইল সত্যেন। তারপর বলল, 'আপনাদের কাছে থাকবার দাবী অর্জন করি নি তো।' তারপর হঠাৎ বলল—'পথে পথে ঘুরে বেড়াতেই আমার ভালো লাগে বেশী। আমি নিজেকেই খুঁজছি যেন। মামার বাড়িতে তাই থাকতে পারিনি।'

তামা বলল—'বেশ না থাকেন, না থাকবেন। আমরা তো আপনার নিজের লোক নই যে জোর করব আপনার উপর। কিন্তু একটা ফরমাস আছে। ফিরে এসে একটা কবিতা যেন দেখতে পাই। টেবিলের উপর কাগজ কলম সব আছে।'

সাতু বলল—'আর একটা কথা। আমাদের এখানে আপনার একটা পার্মানেন্ট নিমন্ত্রণ রইল। যখন খুশী আসবেন। এতে রাজি তো ?'

সত্যেন মুখে হাসি ফুটিয়ে চুপ করে' রইল।

তামা বলে উঠল—'নতুন ধরণের উপমা দিতে হবে কবিতায়। আমরা নূতনত্বের পক্ষপাতী কিন্তু।'

সত্যেন হেসে বলল—'তা তো দেখতে পাচ্ছি। লম্বা কোট পরা মেয়ে এর আগে দেখি নি। এ কোট আপনি করিয়েছেন?'

'না। এটা সাতুদার। আমাদের আরও নতুনত্ব' আছে, শুনবেন? সাতুদা রোজ নামাজ করে আর আমি গায়ত্রী জপ করি—'

সাতু গম্ভীরভাবে বলল—'অথচ আমরা পরস্পরের প্রেমে পড়ি নি।'

কলকণ্ঠে হেসে উঠল দুজনেই।

বিকেলবেলা তামা ফিরে এসে দেখল প্যাডে একটি কবিতা লেখা রয়েছে।

পাকিস্তানের জঙ্গী বর্বররা
বাংলাদেশের মা বোনদের উপর যখন
অকথ্য অত্যাচার করছিল,
জ্বালাচ্ছিল ঘর বাড়ি
চালাচ্ছিল ছোরা ছুরি বেওনেট-বোমা
যখন বাংলাদেশের জীবন্ত আত্মা
জীবন্ত কই মাছের মতো
ছটফট করছিল নৃশংসতার তপ্ত কটাহে,
দেশের বীরত্বসৌরভ যখন
সদ্য-ভাজা ইলিশ মাছের গন্ধের মতো
বিচ্ছুরিত হচ্ছিল দিগদিগন্তে,
তখন আমি কি করছিলাম?
কিছুই করি নি।
এক ফোঁটা জলও পড়ে নি চোখ দিয়ে।
হাহাকারের সাইরেন বাজছিল
বাংলাদেশ জুড়ে

সেই সাইরেন আমি শুনেছিলাম
কিন্তু ছুটে যাই নি পাগলের মতো
সীমান্ত পার হয়ে,
মহাভারতের পাণ্ডব হয়ে গিয়েছিলাম যেন
দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দেখছিলাম মনে মনে
নিষ্ক্রিয় সঙের মতো!
আমাদের সেনারা গিয়েছিল সত্য
কিন্তু আমি যাই নি
আমি নিটোল ছিলাম, অটুট ছিলাম
আমার বুক ভেঙে যায় নি।
কিছুই করি নি আমি।
একেবারে কিছুই করি নি কি?
করেছিলাম, করেছিলাম, মনে পড়েছে—
নপুংসকদের আড্ডাখানায়
টেবিল চাপড়ে তর্ক করেছিলাম
আর চা কফি উড়িয়েছিলাম
কাপের পর কাপ।
তামা, সাতু,
আজ বুঝলাম
তোমরা আমার কেউ নও, অথচ সব।
আজ চোখ ফেটে জল পড়ছে তাই।
থাকতে পারলাম না—তবু
তোমরা আমার নাগালের বাইরে।
চললাম।
আমি তোমাদের কাছে থাকবার অযোগ্য।

॥ ৩ ॥

এই কলকাতা শহরেই মাঝে মাঝে অদ্ভুত গলি দেখা যায় এক একটা। ট্রাম লাইন থেকে দূরে, এঁকে বেঁকে চলে গেছে এ-বাড়ি ও-বাড়ির পাশ দিয়ে। দুপুরে অদ্ভুত নির্জন নিঃশব্দ হয়ে যায় গলিটা। বাড়ির কপাট জানালা সব বন্ধ। পুরুষেরা কাজে বেরিয়ে গেছে, মেয়েরাও হয়তো। যারা কাজে বেরোয় না তারাই বসে আছে ঘরে খিল দিয়ে। ঘুমুচ্ছে বোধ হয়। রেডিওর শব্দ পর্যন্ত নেই।

একজনের বাড়ির ভিতর থেকে একটা নিমগাছ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে গলিটার ওপর। গলিতে ছায়া হয়েছে খানিকটা। সেই ছায়াতেই বসেছিল সত্যেন। পাশে ছিল তার নতুন বন্ধু টোটো। রাস্তার কুকুর একটা। তার সঙ্গে ভাব হয়েছে। একদিন সে যখন জিলিপি কিনে খাচ্ছিল তখন লোলুপ এই কুকুরটাকে দিয়েছিল একখানা জিলিপি। সেই থেকে সে সঙ্গে সঙ্গে আছে। সে ভিক্ষে করে যা পায় তার অংশীদার হয়েছে টোটো। টোটো নামকরণ সত্যেনই করেছে। টোটোর যৌবন নেই। বুড়ো হয়ে গেছে। কাল যখন সে পাঁউরুটির টুকরো ছুঁড়ে দিয়েছিল তখন টোটোর মুখে একটা অদ্ভুত প্রশ্নাকুল দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল। মনে হয় তার নিজের মনোভাবই যেন প্রতিফলিত হয়েছে টোটোর চোখের দৃষ্টিতে। মনে কবিতা জেগেছিল সে দৃষ্টি দেখে। সাধারণত সে কবিতার নামকরণ করে না। কিন্তু এ কবিতাটার নাম দিয়েছিল—সত্যেনের প্রতি টোটো।

সকালে ঘণ্টা-দুই ভিক্ষে করলে আজকাল প্রায় এক টাকা পেয়ে যায় সে। প্রায় ছাতু কিনেই খায়। অনেকক্ষণ ক্ষিদে পায় না। যখন কবিতাটা মনে জেগেছিল তখন ছিল সে পার্ক স্ট্রীটে। মহাসভ্য স্ট্রীট। আগে সাহেবরা এ পাড়ায় থাকত। এখানে ছাতু পাওয়া গেল না। পাঁউরুটি কিনেছিল একটা। টোটো পাঁউরুটি খেয়েছিল সেদিন।

কবিতাটা লিখেছিল কিন্তু গড়ের মাঠে গিয়ে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়েলের ছায়ায় বসে।

সত্যেনের প্রতি টোটো

চলে গেছে যৌবন কলা দেখিয়ে।
কলাটা পেলাম না
তাই মিথ্যে কলা নিয়ে
মানে, ছলা-কলা নিয়ে আছি।
তুমি কিন্তু বলছ যা
আমি তা মানব না।
আকাশে মেঘগুলো
ছড়ানো-ছড়ানো
পেঁজা-পেঁজা
স্তূপ স্তর—নানা রকম।
এখনও কলের ভোঁ বাজেনি
এখনও আমি ডিউটি করছি
গোটাই আছি
ছিন্নভিন্ন হইনি।
নতুন বকলস দেখাচ্ছ আমাকে?
বকলস?
বকলস—হায় হায়—বকলস—
কিন্তু তবু বকলসের লোভ
কাবু করেনি আমায়।
কিন্তু কান খাড়া হয়ে উঠল
তোমার ভদ্রতার আড়-বাঁশীতে
ফুঁ দিলে যখন।
আমার অবশ চেতনার যেন
সাড হল

চাড় হল
হুদ্দাড় করে ছুটে গিয়ে কামড়ে ধরলাম
তোমার ছুঁড়ে-দেওয়া পাঁউরুটির টুকরোটাকে।
কিন্তু হায়-হায়
শেষ পর্যন্ত—হায় হায়—
ভুলে যাই
আমি কুকুর—শুধু কুকুর।

কবিতাটি মৃদুকণ্ঠে পড়ল সে আবার। পাশে চেয়ে দেখল কেউ নেই। কেউ মানে, প্রিয়া। আগেই বলেছি সে প্রতিদিন কল্পনা করে একটি প্রিয়াকে। আজ কল্পনা করছিল নীলাম্বরী একটি শ্যামলী যেন ঝুঁকে দেখছে তার কবিতাটি। ফিরে দেখল কেউ নেই। টোটো কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে শুয়ে আছে। টোটোর হলদে রং। এখনও হলদে আছে, কিন্তু রংয়ের জলুস নেই। গায়ে ঘা হয়েছে মাঝে মাঝে। বুড়ো হয়ে গেছে টোটো।

ছোড়াটা ভাবতে লাগল—আমি যাকে খুঁজছি তাকে পাচ্ছি না কেন ? সে তো যুগে যুগে এসেছে। কাব্যে এসেছে, ইতিহাসে এসেছে, অনেকের জীবনেও এসেছে, আমারও মনের অন্তরীক্ষে এসেছে কতবার রঙীন আভাসে। কিন্তু মূর্তি ধরে আসে নি। একবারও আসে নি। বড় রাস্তায় দলে দলে মেয়ের সারি দেখছে সে। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনকেও দেখে নি যে তার প্রিয়া হবার যোগ্য। কতকগুলো কাপড়ের আলনা যেন হেঁটে চলেছে, কতকগুলো মাংসের স্তূপ। প্রিয়া নয় কেউ। কারো আয়তনয়নে লজ্জিত সুরুচি নেই। সব যেন উদ্ধত কাটখোট্টা। সে আসে নি। খাতা বার করে আর একটা কবিতা শুরু করল সে—।

নাম্মুরের কবি-কণ্ঠ হয়েছিল যবে উদ্বেলিত
সে আহ্বানে এসেছিলে তুমি।
বেথেলহাম-কুটীর-প্রাঙ্গণে

এলেন দেবতা যবে
তুমি এসেছিলে।
শীর্ণ-গঙ্গার অঙ্গ হল যবে শিহরিত
কোশী-নদ-আলিঙ্গনে
তুমি এসেছিলে।
উদ্দাম পিয়ানো-মঞ্চে
বিটোফেন-ভাগনার যবে
আলিঙ্গন-বদ্ধ হল
তুমি এসেছিলে।
এসেছিলে গোলাপের জ্যোৎস্না বিলাসেতে,
এসেছিলে
যূথিকার চুপি অভিসারে
সন্ধ্যার গন্ধান্বিত অন্ধকার পথে।
কিন্তু হায় এলে না তো
যবে আমি
অখ্যাত পথের ধারে
বসে আছি কন্থা-সম্বল
তপ্ত পীচের পরে
আর্ত প্রত্যাশায়—
এলে না তো।
দুর্দান্ত প্রত্যাশার অগ্নি জ্বলে
হুহু-চুল্লী সম,
মন মোর জ্বালামুখি যবে
স্নিগ্ধ বারি সম তুমি এলে না তো।
ঘামাচি-বিক্ষত-পৃষ্ঠে
তোমার পেলব বাহুলতা
ক্ষণ-স্পর্শ দিল না তো।

এলে না—এলে না
মধ্যাহ্নের সূর্য সাক্ষী
হে মোহিনী, হে অবর্ণনীয়া,
মোর কাছে একবারও আসনি ভুলিয়া।

কবিতা লেখা শেষ না হতেই নির্জন গলিটা সহসা কার আর্তরবে যেন মুখরিত হয়ে উঠল। একটু পরেই দেখা গেল চোং-প্যাণ্ট-পরা একটা ষণ্ডা জুলফিদার ছেলে একটা দশ-বারো বছরের ছেলেকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। ছেলেটার আর্তরবে ভরে উঠল গলিটা। উপরের একটা ঘরের জানলা খুলে গেল। ষণ্ডা ছেলেটা বলল—বাড়ি চল, জুতিয়ে তোমাকে লম্বা করব।

টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। অদৃশ্য হয়ে গেল গলির বাঁকে। টোটোর ঘুম কিন্তু ভাঙে নি। সে যেমন কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল তেমনি ঘুমুতে লাগল। সে নির্বিকার।

একটু পরেই আবার নিঃশব্দ হয়ে গেল নির্জন গলিটা। কিন্তু বেশীক্ষণ নিঃশব্দ রইল না। নিমগাছটার উপর বুলবুলি ডেকে উঠল একটা। সে ডাক অবর্ণনীয়। কাকে যেন খুঁজছে। পরক্ষণেই উড়ে গেল। সত্যেনের মনে হল তার মনটাই বুঝি বুলবুলি হয়ে গাছে গাছে খুঁজছে তার সঙ্গিনীকে।

মনের ভিতর থেকে আর একজন কে বলে উঠল—শুধু সঙ্গিনী পেলেই কি খুশী হবে? সঙ্গিনীর আনুষঙ্গিক যে সব জিনিস অপরিহার্য তা যোগাড় করবার সামর্থ্য তো নেই তোমার? তুমি অসমর্থ, তুমি গরীব, বিজ্ঞানের ভাষায় 'আনফিট'। সঙ্গিনীকে ঘিরে আদর্শ সংসার না গড়লে অকস্মাৎ তোমার সমস্ত শরবৎ চিরতার চেয়ে তেতো হয়ে যাবে এ জ্ঞান তোমার অবচেতনলোকে টনটন করছে। আর সেই টনটনানির জ্বালায় তুমি যে সব কবিতা লিখেছিলে তাতে বিদ্রূপ করেছিলে নিজেকেই। কবির স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে তুমি সত্যকেই দেখেছিলে, দেখেছিলে নিজের অন্তঃসারশূন্য-

তাকে। লিখেছিলে—অশ্বত্থ বটকে অস্বীকার করছে ব্যাঙের ছাতারা / সারপেনটাইন লেনে বিরাট জনসভার আয়োজন তাই / ঘেঁটু-পন্থী ধুরন্ধরেরা কচু-কাটা করছেন কাল-কাসিন্দা-পন্থীদের / বলছেন—সাবধান, সাবধান / এসব খবর কাগজে বেরোয় না / কিন্তু দিলমহলের গোপন কপাট খুলে দেখ, / দেখবে সেখানে লেখা আছে / আলকাতরার যুগ এসেছে / সূর্য চন্দ্র নিবে যাবে, / জয় হবে কেরোসিনের ডিবরির। / তার সঙ্গে সমঝোতায় যদি আসতে পার / আর আমাদের ফাণ্ডে যদি টাকা দাও / মাখন-মাখানো টোস্ট মিললেও মিলতে পারে / হয়তো দু'একটা আণ্ডাও। / নচেৎ নয় নচেৎ নয়। / মনে রেখো, যদিও আমাদের পা-জামাটা নোংরা হয়ে যায় বারবার / তবু আমরা বীর। / আমরা বিদ্রোহী। / অসম্ভবকে সম্ভব আমরা করবই॥ এ কবিতা তুমি লিখেছিলে আত্মধিক্কারে। মনের মধ্যে দুর্মুখ বিবেকটা বসে আছে। তাকে নিস্তব্ধ করা যায় না। কারণ সে সত্যবাদী।

সত্যেন কেমন যেন বিহ্বল হয়ে বসে রইল। সে সত্যি ভালো হয়ে থাকতে চায় কিন্তু পরিবেশ এমন হয়েছে যে কিছুতেই তা থাকা যাচ্ছে না।

দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রইল সে। মনে একটা অদ্ভুত আকুলতা জাগছিল। মনে হচ্ছিল যত কষ্টই হোক যত দুঃখই পথ আঁধার করে আসুক আমাকে উঠতে হবে, ফুটতে হবে, জ্বলতে হবে। বাঙালীর উত্তরাধিকার বহন করছি আমি, সে উত্তরাধিকারের মান আমি রাখবই। হঠাৎ মনে পড়ল নেতাজীর কথা। মনে হল তিনি পাঠানদের দেশে আত্মগোপন করে বসে ছিলেন এক বোবা কাবুলী সেজে। তার আগে জেল খেটেছিলেন বহুবার। বেণীমাধব দাস উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাঁকে দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে। বিবেকানন্দ করেছিলেন দেশের মানুষের দিকে, গান্ধীজীর বাণী যখন দেশের সমস্ত মানুষের কানে গিয়ে পৌঁছল

তখন—হঠাৎ নেতাজী যেন গাঢ় অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে গেলেন আর সেই অন্ধকার ভেদ করে বেরিয়ে এল এক অপরূপ যুবতী। সালোয়ার পরা, মুখের সামনে ওড়না আর সমস্ত মুখে লজ্জা। সে যে কী শালীনতা কী রূপ তা সত্যিই অবর্ণনীয়। মনে হল সন্ধ্যা যেন আরও নিবিড় হয়ে এসেছে। কেউ প্রদীপ জ্বালে নি—সে কিন্তু জ্যোতির্ময়ী। নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। তার লজ্জার আবরণ যেন ঘন থেকে ঘনতর হয়ে উঠছে, তবু কিন্তু ঢাকতে পারছে না তাকে। স্বয়ম্প্রভ সপ্রতিভ দাঁড়িয়ে আছে সেই পাঠানী মেয়ে। মনে হল কাবুলের পাঠানদের ভদ্রতা যেন মূর্ত হয়েছে মেয়েটির মধ্যে। ওই ভদ্রতাই যেন নেতাজীকে আগলে ছিল। সত্যেন মনে মনে একদৃষ্টে চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর মনে মনেই কবিতা রচনা করতে লাগল। খাতা বার করে আর লেখবার সাহস হল না। ভয় হল চোখ খুললেই চলে যাবে সে।

…নিষ্প্রদীপ সন্ধ্যায় নৈষ্কর্ম্যের কাঁথা গায়ে দিয়ে / রোমন্থন করছিলাম নিজের দুর্দশার সঙ্গে রাজনৈতিক খবর। / এমন সময় তুমি এসে অপরূপ যে খবরটা দিলে / তা রাজনৈতিক নয় লাজনৈতিক। / তোমার লজ্জা হয়তো তোমার ভূষণ / কিন্তু আমার কাছে তা দুর্ভেদ্য বাধা। / সে বাধা অতিক্রম করি / এমন শক্তি আমার নেই। / আমি সীমিতবিক্রম। / আমার কল্পনার এরোপ্লেনও আমার ছোট আকাশ ছাড়িয়ে যেতে পারল না। / আমার ট্যাঙ্কের ঘর্ঘর বকুল-বীথির মর্মর হয়ে গেল। / আমার বোমা ফাটল আমারই বুকে / রক্তাক্ত হয়ে গেল আমার সত্তা। / আমার যুদ্ধ-বাহিনী মুগ্ধ হয়ে প্রণত হল তোমার পদ-প্রান্তে। / তোমার ওই ময়ূরকণ্ঠী পাখতুনী সালোয়ারের পাটে পাটে যে রূপের হাট বসেছে, / সেখানে পশরা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবে কি? / খেলনার পশরা নয়, / নিয়ে যাব প্রণামের পশরা। / তুমি আমাদের নেতাজীকে রক্ষা করেছিলে একদিন।…

দুম করে একটা শব্দ হল।

চমকে জেগে উঠলো টোটো। সত্যেনও হাঁটুর ভিতর থেকে মুণ্ড বার করে দেখলে কয়েকটা ছেলে ছুটে পালাচ্ছে। গলির বাঁকে একটা ধূমায়িত পটকা। ওরাই কি পটকা ফাটিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে? কেন? এই নিদারুণ গ্রীষ্মে পটকা ফাটাচ্ছে কেন? নিদারুণ গ্রীষ্মের বিরুদ্ধেই কি বিদ্রোহ করেছে ওরা? আগুনের দিকে আগুন ছুঁড়ছে? হঠাৎ মনে হল ওরা বোধ হয় পিপাসার্ত। ওরা বর্ষা-বিলাসী ডাহুকের দল গ্রীষ্মের পাল্লায় পড়েছে। তাই পটকা ফাটিয়ে বিদ্রোহ করছে। কিন্তু পারছে না। ছুটে পালাতে হল। প্রায় অসম্ভব বেগে উড়ে চলে গেল ডাহুকের দল।

কবিতা জাগল মনে। কিন্তু আর খাতা বার করলে না। মনে মনেই কবিতা মূর্ত হল তার মনে। সে ঠিক করলে আর খাতায় কবিতা লিখব না। খাতার পাতা গেছে ফুরিয়ে, পেন্সিল ভোঁতা হয়ে গেছে। চোখ বুজে ভাবতে লাগল। যে ছেলেগুলো ছুটে পালাল তারা সবাই হাফপ্যান্ট পরা। কিন্তু তবু ওর মনে হল ওরা মানুষ নয় ডাহুক।

প্রায় অসম্ভব বেগে হাফ-প্যান্ট পরা ডাহুকের দল উড়ে গেল। উড়ে গেল সেই ঝাউবনে যে বনের ঘনিষ্ঠ আঁধারে জল থই-থই। পৃথুলা হংসীরা হয়তো সেখানে আছে। আর আছে আঁধার কুহক-গুহা কুম্ভক-গম্ভীর বন। আর আছে চিরশ্রাবণের চিরনিবিড়তা। মানুষের বেশে ছিল যারা গ্রীষ্মনিপীড়িত, ডাহুকের বেশে উড়ে গেল তারা শীতল-শীকর-স্নিগ্ধ কাজ্জলিত কাজরীর দেশে। বেদনার দীর্ঘশ্বাস মেঘ-রূপ ধরেছে যেখানে—হঠাৎ চমকে উঠল সত্যেন। তার গালের উপর কার নিশ্বাস পড়ল যেন।

চোখ খুলে দেখে টোটো তার কানে কি যেন বলবার চেষ্টা করছে। টোটোর চোখে উৎসুক দৃষ্টি। চল এবার ওঠা যাক এখান থেকে।

সত্যেন উঠে আবার চলতে লাগল। টোটোও চলতে লাগল পিছু পিছু। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখলে গোটা দুই বিস্কুট আছে। একটা টোটোকে দিয়ে আর একটা নিজের মুখে পুরল, তারপর মনে হল—তেষ্টা পেয়েছে। এই দুপুরে রাস্তার কলে কি জল পাওয়া যাবে? হাঁটতে লাগল।

॥ ৪ ॥

একটা বড় রাস্তার ধারে ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়েছিল সত্যেন। তার ডান পাশে একটা তরকারির দোকান, বাঁ পাশে ফলের। পিছনে একদল প্যাণ্ট-পরা ছেলে দাঁড়িয়ে হল্লা হাসাহাসি করছে, পাশেই একটা পানের দোকান, সেখানে গাঁক গাঁক করে রেডিও বাজছে একটা। রাস্তায় একদল ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ট্রাম বাসের আশায়। তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে একটা গরুর গাড়ি। গরু দুটোর শিং প্রকাণ্ড, তার পিছনে একটা ঠেলা, তার পিছনে ইলেক-ট্রিক হর্ন দিচ্ছে একটা মোটর, তার পিছনে সারি সারি মোটর। এরই মধ্যে একটা কুলী একটা খরমুজা খাচ্ছে ফুটপাথে বসে। সামনের দেওয়ালে প্রকাণ্ড একটা মেয়ের ছবি। প্রায়-উলঙ্গিনী একটি মেয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে। ঠিক তার নীচেই একদল ভিখারী গৃহস্থালি পেতে বসেছে। হ্যাঁ, রীতিমত গৃহস্থালি। একটা হাঁড়িতে ছোট্ট উনুনে রান্না চড়েছে তাদের। পাশেই ফুটপাথে শুয়ে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে একটা কচি ছেলে, কেউ দেখছে না তাকে। তার পাশে বিড়ি খাচ্ছে একটা বিশ্রী বুড়ো। তার ডান দিকে বসে আছে ঘাগরা পরা একটা সোমত্ত মেয়ে। রাস্তার দিকে চেয়ে আছে আর দুহাত দিয়ে মাথা চুলকোচ্ছে নাক-মুখ কুঁচকে। বুকের আবরণ যে সরে গেছে সেদিকে লক্ষ্য নেই। তার নিরাবরণ বুকের

উপর লক্ষ্য পড়েছে অনেকের। প্যাণ্টপরা ছোঁড়াগুলো সম্ভবত ওই জন্যেই দাঁড়িয়ে আছে তার পিছনে। একটু দূরে রাস্তার উপর ঝাঁকা নামিয়ে বসে আছে জন-কয়েক ঝাঁকা-মুটে। সবাই অবাঙ্গালী। দুজন ছাতু খাচ্ছে মনে হল।

সত্যেনও কিছু ছাতু কিনতে চায়। অনেকক্ষণ থেকে খুঁজছে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না ছাতুর দোকান। একটা ঝাঁকার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—ভাইয়া ছাতু কাঁহা মিলবে?

বিহারী ঝাঁকাটি উত্তর দিলে তার স্বকীয় বাংলায়—'ওই সামনেহর গল্লী দেখছেন ওইখানে চলিয়ে যান। পুছ করুন—সুরপতিয়ার দোকান কোথা। পাত্তা মিলে যাবে। সিংজির বড়া মকান আছে, সেই মকানের নীচে সুরপতিয়া থাকে। বঁঢ়িয়া সাততু মিলবে।'

সত্যেন এদিকে ওদিকে চেয়ে দেখল টোটো নেই। কোথা গেল সে? কাছে-পিঠে নেই সে। হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে এল তার। আবার সে সচেতন হল সে নিজেকে খুঁজছে। খুঁজছে তার উত্তরাধিকার। কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে সে উত্তরাধিকার কি খুঁজে পাবে সে? খুঁজে যদি পায়ও তাহলেই বা কি চতুর্বর্গ লাভ হবে তার? জনতার স্রোত বয়ে চলেছে, এর মধ্যে বাঙ্গালী কারা? হাতকাটা জামা আর চ্যোং-প্যাণ্ট ছাড়া আর তো কিছু দেখা যায় না। অনেকের পেটে বোমা মারলে হয়তো বাঙ্গালী ডাল ভাত চচ্চড়ি বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু বাইরেটা বদলে ফেলেছে সবাই। সব একরঙা হয়ে গেছে। কিন্তু বাঙ্গালীত্ব কি শুধু পোশাকে? বিদ্যাসাগর বাঙ্গালী ছিলেন, কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসও বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালী ছিলেন রামমোহন রায়, বাঙ্গালী ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বাঙ্গালী ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। পোশাক তো এক নয়। সব যেন গুলিয়ে গেল।

রাস্তা পার হচ্ছিল সে। ভিড়ের গুঁতো খেয়ে মোটরের পাশ দিয়ে ঠেলাগুলো বাঁচিয়ে রিকশাকে পাশ কাটিয়ে আস্তে আস্তে

এগোচ্ছিল সে গলিটার দিকে। এমন সময় একটা প্রকাণ্ড অদ্ভুত গাড়ি পথরোধ করে দাঁড়াল। গাড়ির উপর মই একটা আরও কত কি। একজন বলল—ট্রাম-লাইন সারাবার গাড়ি। তার উপরও প্যাণ্ট-পরা হাতকাটা-জামা-গায়ে কয়েকটা লোক। বাঙ্গালী ওরা কি? বোঝা যায় না।

সন্তর্পণে বড় রাস্তাটা পার হয়ে ওপারের ফুটপাথে গিয়ে উঠল। ফুটপাথে পা রাখবার জায়গা নেই। একজন বসে আছে অনেক ছুরি কাঁচি চাবির রিং আর তালা নিয়ে। তার পাশেই চানাচুরওয়ালা মাথায় রঙ্গীন পাগড়ি, পরনে রঙ্গীন ফতুয়া গোঁফ, সূচ্যগ্র। হঠাৎ সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল—বাদাম কাজু মট্‌ট্‌র মুং। বাঙ্গালী নয় অবাঙ্গালী। বোধহয় উত্তর প্রদেশের লোক। এ কিন্তু প্যাণ্ট পরে নি। পরনে মালকোচা-মারা কাপড়। মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখল—চোখে সুর্মা পরেছে। না, বাঙ্গালী নয়। হঠাৎ তার মনে হল এরা কেউ মানুষই নয়। সব স্বার্থসন্ধানী বকের দল। এই কলকাতা শহরটা বিরাট একটা জলা, সেখানে লক্ষ লক্ষ মৎস্যসন্ধানী বক ঘোরাফেরা করছে। মোটর রিকশা ঠেলা ট্রাম বাস—সব বক।

গলির মুখে একটা ফাঁকা বারান্দা পেল। সেইখানেই বসে পড়ল। কাছেই একটা ছোঁড়া মুখে হাত পুরে 'সিটি' দিলে একটা। তারপর ছুটে চলে গেল। সত্যেন ভুলে গেল ছাতু কিনতে হবে। বসে বসে রাস্তার দৃশ্য দেখতে লাগল সে। এ দৃশ্যে সূর্য নেই চন্দ্র নেই নক্ষত্র নেই সন্ধ্যা নেই ঊষা নেই। আছে খালি মানুষ, মানুষ আর মানুষ। আর নানারকম যানবাহন আর নানারকম চীৎকার। সিনেমার উন্নত বক্ষ মেয়েটার ছবিও দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে এই জনতার দিকে। মুখে মুচকি হাসি। হঠাৎ এ দৃশ্যও লুপ্ত হয়ে গেল সত্যেনের চোখ থেকে, ফুটে উঠল বিরাট একটা জলার ছবি। কবিতা জাগল মনে।

সম্মুখে বিস্তৃত জলা। তার উপরে লক্ষ লক্ষ
বক। মুনাফা-সন্ধানী বণিকের মতো সন্তর্পণে
সঞ্চরিছে। বৈপ্লবিক বুদ্ধি এক জাগিছে মগজে
জলাটারে জমাইয়া বরফ করিয়া ফেলি যদি,
বকেরা পালাবে। আসিবে হয়তো লক্ষ লক্ষ
পেঙ্গুইন পাখী, মোটাসোটা হৃষ্টপুষ্ট তুলতুলে
চর্বিদার জীব সব। কি হয় তাহলে?
নিঃসন্দেহে অভিনব হয় কিছু। কিন্তু হায়
কিছুই হল না, কল্পনা ফুরায়ে গেল।
হঠাৎ এ কি এ! বকবকম করিছে বকেরা।
বকেরা হয়েছে পায়রা। পায়রাও তুলতুলে,
পায়রাও সুখাদ্য অতীব, পায়রার নানা রং,
পায়রার নানা গুণ—

'এই হটো হিঁয়াসে—'

ঘরের ভিতর থেকে বলিষ্ঠ একজন লোক শতরঞ্জি পাততে লাগল বারান্দার উপর। শতরঞ্জির উপর চেয়ার রাখা হল। তারপর এল একটা গড়গড়া। তারপর এলেন নগ্নগাত্র কুচকুচে কালো থলথলে মোটা একটি লোক। তাঁর বাঁ হাতে প্রকাণ্ড একটা সোনার তাবিজ। ভড়াক ভড়াক করে তামাক খেতে লাগলেন। পিছনে একজন চাকর দাঁড়িয়ে হাওয়া করতে লাগল তাঁকে।

সত্যেন গলির ভিতর ঢুকে পড়ল।

টোটো—টোটো—চীৎকার করলে দুবার। টোটোর দেখা নেই। কোথায় গেল সে? একটু এগিয়েই সে দেখতে পেল সুরপতিয়ার দোকান। দোকাদের সামনেই বসে আছে সুরপতিয়া। চেহারাটা কিন্তু বেসুরো। প্রকাণ্ড গোল মুখ, মাথার সামনের দিকে টাক, ফরসা রং, বেজায় মোটা, দুহাতে প্রচুর উল্‌কি, দুপায়ে গোদ।

'ছাতু পাওয়া যায় এখানে?'

পরিষ্কার বাংলায় উত্তর দিল সুরপতিয়া। 'যায় বইকি। একটু দাঁড়াও বাবা, এটা ঘেঁটে দিই একটু—'

ফুটপাতের উপরেই একটি উনুনে কি যেন ফুটছিল একটা হাঁড়িতে। সেইটেতে কাঠের হাতার মতো জিনিস ঢুকিয়ে নেড়ে দিলে সুরপতিয়া।

'কিসের ছাতু চাই?'

'অর্ধেক বুট আর অর্ধেক যবের।'

'কত?'

'চার আনার।'

'চার আনার ছাতুতে আগে পেট ভরত। এখন ভরবে না। তুমি খাবে?'

'আমি আর টোটো—'

'দুজনের পেট চার আনাতে ভরবে না।' সুরপতিয়া উঠে ঘরের ভিতর গেল। ধনীর প্রাসাদের বারান্দার নীচে ছোট্ট একখানি ঘর। ঘর না বলে তাকে গুহা বলা উচিত। একটি ছোট দরজা ছাড়া আর কিছু নেই। সেই দরজার ভিতর হেঁট হয়ে ঢুকে গেল সুরপতিয়া। একটু পরে বেরিয়ে এল আবার হামাগুড়ি দিয়ে। হাতে একটা কাগজের ঠোঙায় ছাতু। সত্যেন আগেও ছাতু কিনেছে। দেখল সুরপতিয়া যত ছাতু এনেছে তার দাম এ বাজারে চার আনার অনেক বেশী।

'অত ছাতু আনলে যে। আমি তো মাত্র চার আনা দেব।'

'চার আনাই দাও। তুমি কোথায় কাজ কর?'

সত্যেন চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল—'আমি কাজ করি না। ভিক্ষে করি—'

'ভিক্ষে কর! ছিয়া ছিয়া ছিয়া। কাজ কর না কেন বাবা! আমার ছেলে মিলে কাজ করে, আমার ছেলের বউ ঝি-গিরি করে, তার একটা মেয়ে আছে সেও ঘোষবাবুর ছোট ছেলেকে নিয়ে দুবেলা

বেড়াতে যায় গাড়ি ঠেলে ঠেলে।'

সত্যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল—'তোমার বাড়ি কোথায়—'

'ভাগলপুর জেলায় কহলগাঁও।'

'সেখান থেকে এখানে এসেছ কেন?'

'রোজগারের ধান্দায়। ঘরে আমার বুড়ো শ্বশুর আছেন, শাশুড়ী আছেন। তাদের প্রতি মাসে টাকা পাঠাতে হয়। কহল গাঁয়ে বেশী রোজগার করবার উপায় নেই।'

'উনুনে কি হচ্ছে, ভাত?'

'না। মকাইয়ের ঘাঁটা। ভাত খাবার মতো পয়সা নেই। মকাইয়ের ঘাঁটা খায় ওরা। ভাতের সঙ্গে তরকারি চাই, ডাল চাই—সব মাগ্‌গি।'

'কত রোজগার হয় তোমাদের?'

'সবাই মিলে প্রায় চারশ টাকা রোজগার করি আমরা।'

'আমি এত ছাতু নেব না। তুমি চার আনার ছাতুই দাও আমাকে—'

সুরপতিয়া স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সত্যেনের দিকে কয়েক মুহূর্ত।

'বেশ।'

আবার সে ছাতুর ঠোঙা নিয়ে ঢুকল গুহার মধ্যে। আধ ঠোঙা ছাতু নিয়ে বেরিয়ে এল আবার।

'নাও।'

'একটু জল দিয়ে মেখে দেবে না?'

'তুমি যখন আমার সঙ্গে দোকানদারী করলে আমিও করব। জল দিয়ে মেখে দিতে হলে দু পয়সা বেশী দিতে হবে।'

সুরপতিয়া ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সহাস্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সত্যেনের দিকে।

সত্যেনের কাছে আরও পয়সা ছিল।

বার করে দিল সে আরও দু নয়া।

'ঢের হয়েছে ঢের হয়েছে। তুমি তো ভিখ-মাংগা নও তুমি তো নবাব—দাও—' আবার ছাতুর ঠোঙ্গা নিয়ে ঢুকল সে ঘরের ভিতর। ছাতু মেখে নিয়ে এল এক দলা। সত্যেনের মনে হল দলাটা বেশ বড়।

'আবার বেশী দিয়েছ মনে হচ্ছে।'

'ফের যদি কচকচ কর আমি ছাতু দেব না।'

অদ্ভুত একটা মাতৃমূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সুরপতিয়াকে ঘিরে। সত্যেন অবাক হয়ে গেল। এই অহেতুক স্নেহের কারণ কি বুঝতে পারল না সে। জিগ্যেস করবার সাহসও হল না। অবাঙ্গালীদের সম্বন্ধে একটা বিতৃষ্ণাই তার ছিল এতদিন। সুরপতিয়ার স্পর্শে এসে সব মধুর হয়ে গেল যেন। মনে হল চিরন্তনী মা সব দেশে সব জাতের মধ্যে আছে। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল. 'মা আমাকে মাপ কর। আমি চললাম।'

সুরপতিয়া বললে—'আমি ভিখ মাংগার মা হই না, আমি নবাবের মা হই না, আমি গরীব ভদ্রলোকের মা—'

সত্যেন তার সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। হাতজোড় করে প্রণাম ক'রে চলে গেল তাড়াতাড়ি।

যেতে যেতে একটা কথা মনে পড়ল তার। আজকাল অনেকে বলছেন কলকাতায় অবাঙ্গালীদের এই আধিপত্য সহ্য করা উচিত নয়। কিন্তু এই অবাঙ্গালীরা যদি কলকাতা ছেড়ে চলে যায় তাহলে তাদের কাজ বাঙ্গালী ছেলেরা করতে পারবে কি? কুলী হতে পারবে? রিকশ টানতে পারবে? ফেরিওয়ালা হতে পারবে? মেহনতের কোন কাজটা করতে পারবে তারা? তারা তো মোড়ে মোড়ে চোংপ্যান্ট আর হাফ সার্ট পরে জটলা করে রাজা উজির মারে, ক্রিকেট আর ফুটবল্ খেলার মাঠে ভিড় জমায়, সিনেমার টিকিট কেনবার জন্যে 'কিউ' দেয়। আর করে স্ট্রাইক, করে সভা—

হঠাৎ তার চিন্তাধারা বিঘ্নিত হল। টোটো কোথায়! এদিক ওদিক চেয়ে দেখল কোথাও টোটো নেই। গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এল, সেখানেও নেই। বাঁ ধারে চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই পার্ক পাওয়া গেল একটা। তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পার্ক নয়, চারিদিকে রেলিং দিয়ে ঘেরা ফাঁকা জায়গা খানিকটা। তার গেটও আছে একটা। সত্যেন সবিস্ময়ে দেখল সেই পার্কের ভিতর টোটো প্রেম করছে। কুকুরীটা পাঁশুটে রঙের। টোটোর প্রেমলীলায় বাধা দিতে ইচ্ছে হল না তার। রাস্তার কলে জল ছিল। সেইখানে গিয়ে অর্ধেকটা ছাতু খেয়ে ফেললে সে। তারপর জল খেল অনেকটা। টোটোর জন্যে রেখে দিলে খানিকটা ছাতু। তারপর গিয়ে বসল সামনের বাড়ির রকে। মনে হল ভাগ্যে আগেকার বাবুরা রক বানিয়েছিলেন তাই আমরা বসে বাঁচছি। দেখা গেল নায়িকা আমোল দিচ্ছে না টোটোকে। খ্যাঁক খ্যাঁক করে ধমকাচ্ছে। টোটো কিন্তু না-ছোড়। খ্যাঁকানি খেয়েও ঘুরে বেড়াচ্ছে কুত্তীটার পিছু পিছু। হঠাৎ সত্যেনের ভাবান্তর হল। সে যেন নিজেকেই প্রত্যক্ষ করল টোটোর মধ্যে। মনে হল টোটো যা নির্লজ্জের মতো সবার সামনে করছে সে-ও কি তাই করছে না কবিতার আড়ালে? কবিতা জাগল মনে।

উৎপল-প্রসন্ন আঁখি নয়তো উহার। সাদামাটা
কুতকুতে চোখ। কান খাড়া খাড়া, ল্যাজটি
জিলিপি। ইহাতেই মুগ্ধ টোটো। আমিও কি নই?
স-লোম নির্লোম কান-খাড়া
কান-ঝোলা বিপুচ্ছ শ্রীপুচ্ছ ছাই-রঙা
নাক-বোঁচা যাহোক একটা
যোষিৎ হলেই হল।
দেখা হইলেই বাড়ায়ে দুবাহু
আকুতি-আকুল-কণ্ঠে উঠিব ডাকিয়া--

আতুত, আতুত। ছাতে জানালায়
রাজপথে অলিতে গলিতে
সার বেঁধে চলিয়াছে শত শত
পিঠ-কাটা-ব্লাউসধারিণী।
বংশবনে অন্ধ ডোম সম খাইতেছি ঘুরপাক
হস্তে লয়ে ভোঁতা কাটারিটি।

প্রণয়-রণে ভঙ্গ দিয়ে হঠাৎ টোটো ছুটে বেরিয়ে এল পার্ক থেকে, আরও দুটো ষণ্ডা কুকুর তাড়া করেছে তাকে। মরি-বাঁচি ছুট দিয়ে রাস্তার ভিড়ের মধ্যে এসে পড়ল সে। ক্যাঁচ করে একটা মোটর ব্রেক কষল। একটা ঠেলার তলা দিয়ে এসে হাজির হল সত্যেনের কাছে। এসে ল্যাজ নাড়তে লাগল, যেন কিছুই হয়নি। সত্যেন ছাতুর দলাটা দিল তাকে। গপ করে খেয়ে ফেলল। কয়েকটা কশাই একপাল গরু নিয়ে যাচ্ছে। তার পিছনের একজনের মাথায় এক ঝাঁক মুরগী। হর্ণ দিতে দিতে এগিয়ে এল প্রকাণ্ড একটা লরি। লরিতে বস্তাবন্দী হাড়। একটা হাড় বেরিয়ে আছে। ফুটপাথে একটা ফলওয়ালী একটু পিছন ফিরে বসে স্তন্যদান করছে তার শিশুকে···সবাই চলেছে কিন্তু কারো প্রতি কারো ভ্রূক্ষেপ নেই, পাশাপাশি চলেছে কিন্তু চেনে না কেউ কাউকে, চিনতে চায় না। একটা অতি বৃদ্ধা কুঁজো লাঠি ঠক ঠক করতে করতে বেশ দ্রুতবেগে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে বলল—কিছু দেবে বাবা? সত্যি বড্ড গরীব আমি।

সত্যেন এক নয়া পয়সা দিলে তাকে। তার পরই উঠে পড়ল।

'টোটো চল এখান থেকে—'

মনে পড়ল পঞ্চার সেই উপদেশটা। পঞ্চা বলেছিল—কোলকাতার রাস্তায় কোথাও দাঁড়াস নি! ভিক্ষে চাইবে ধাক্কা মারবে, ঠিকানা খুঁজে দিতে বলবে, মাথায় আবর্জনা ফেলবে, পকেট কাটবে। কোলকাতায় রাস্তায় দাঁড়াতে নেই। চলতে হয়

ছুটতে হয়।

সত্যেন হন্ হন্ করে ছুটতে লাগল
টোটোও চলেছে তার পিছু পিছু।
কিন্তু কোথা যাবে তারা ?

যাবার জায়গা কোথাও নেই। কলেজ স্ট্রীট পাড়াটাকে সে এড়িয়ে চলছিল। মনে হত—তার বিগত জীবনটা, যে জীবনে সে মামার পয়সায় পড়াশোনা করত, মামার পয়সায় রেস্তোরাঁয় বসে চপ কাটলেট খেত, কফি-হাউসে গিয়ে রাজনীতির তর্ক করত—সেই জীবনটা এখনও বোধহয় ওত্ পেতে বসে আছে সেখানে। সেখানে গেলেই হয়তো খপ করে তাকে চেপে ধরবে। দেখা হয়ে যাবে কোনও চেনা বন্ধুর সঙ্গে বা প্রফেসরের সঙ্গে বা সেই চায়ের দোকানের মালিকের সঙ্গে যার কাছে এখনও হয়তো কিছু দেনা আছে তার। কিম্বা মির্জাপুর স্ট্রীটের দ্বিতল বাড়ির জানলায় যে মেয়েটি একদা তার মনোহরণ করেছিল, কিন্তু যার সঙ্গে সে বাক্যালাপ করবার সুযোগ পায় নি—এরা হয়তো এখনও আছে সেখানে। তাদের কাছে ভিখারীর বেশে সে যাবে কি করে ? না, কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় সে যেতো না। কোলকাতায় স্ট্রীটের অভাব নেই গলির অভাব নেই, কলেজ স্ট্রীটকে সে এড়িয়ে চলত। প্রায়ই কিন্তু তার মনে হতো এর জন্য কে দায়ী ? এই যে জঘন্য চোরের মত ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে, ভিক্ষে করে খেতে হচ্ছে—এর জন্যে কে দায়ী ? সে নয়। তার মামা তাকে স্কুলে ঢুকিয়েছিলেন, সে একটার পর একটা পরীক্ষা পাস করে গেছে। কোনও কোনও পরীক্ষায় বেশ ভালই করেছে কিন্তু যেই লেখা-পড়া শেষ হয়ে গেল অমনি তাকে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হল কেন ? কারণ সে চাকরি করা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না।

সে নোটবুক থেকে মুখস্থ বলতে পারে চন্দ্রগুপ্ত কজন ছিল। রোম কখন গ্রীসকে আক্রমণ করেছিল। এলিজাবেথের স্প্যানিশ

আর্মাডার প্রেরণা কে ছিল, বৈদিক সভ্যতা আর ঔপনিষদিক সভ্যতার তফাৎ কি? এই সব তার কণ্ঠস্থ আছে কারণ সে ইতিহাসের বই অনেক পড়েছিল। কণ্ঠস্থ ছিল কারণ ভেবেছিল কণ্ঠস্থ করলে ডিগ্রী পাওয়া যাবে আর ডিগ্রী পেলে চাকরি। কিন্তু গোলামখানার গেটে লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ের ভিড়! সবাই চাকরি চায়। ঘুষ, তদ্বির, নেপটিজম্, দালালির নানা খেলা চলছে সেখানে। চাকরি পাওয়া যাবে না। কিন্তু চাকরি না পেলে সে করবে কি? নোটবুক মুখস্থ করা বিদ্যে ছাড়া আর তো তার কোন সম্বল নেই। সে জুতো শেলাই করতে জানে না, দর্জিগিরি জানে না, ছুতোরগিরি জানে না, ফিরি করতে পারে না, মোট বইতে পারে না, ছাত পিটতে পারে না —রাঁধতে পারে না, যারা ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, যারা প্লাম্বার তাদের দলেও নয় সে। দম্ভভরে সে ওদের নাম দিয়েছে 'ছোটলোক'। ভুলে গেছে যে আসল ভদ্রলোক ওরাই, ওরা নিজের গতর খাটিয়ে নিজের জোরে মাথা উঁচু করে বেঁচে আছে। ওরাই স্বাধীন, কারও দ্বারে হাত পাতে না, কারো কাছে মানসম্ভ্রম মনুষ্যত্ব বিক্রি করে চাকরি করে না। বুঝতে পারে না সবচেয়ে অসহায় সে নিজে। সবচেয়ে কৃপাপাত্র। নোট মুখস্থ করা বিদ্যা ছাড়া ইতিহাসের কতটুকু আয়ত্ত করেছে সে? কিছুই না। কেরানীগিরি করা ছাড়া আর কি করতে পারে সে? কিছুই না। কিন্তু তার দোষ কি। তাকে ছেলেবেলা থেকে যেমন করে গড়া হয়েছে তেমনি হয়ে উঠেছে সে। এখন কি করবে···কি করবে···মামার স্কন্ধে আর বেশীদিন থাকতে পারছিল না সে, মামা-মামীর নীরবতাই যেন তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, তাই সে পালিয়ে এসেছে। মনে হয় মামা-মামী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন।

কিন্তু এখন কি করবে? ক'দিন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। টোটোও ঘুরছে তার সঙ্গে সঙ্গে। এটা বুঝেছে ভিক্ষে করে পেটটা চালিয়ে নেওয়া যায়। কিছু উদ্বৃত্তও থাকে। সেদিন একটা গেঞ্জি কিনেছে। কিন্তু মনের ভিতর আগুন জ্বলছে। হাহাকারের

আগুন, জিজ্ঞাসার আগুন, উচ্চাশার আগুন। সে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছে কলকাতার বাইরে। এখানে নতুন নতুন বাড়ি উঠছে। মাঝে মাঝে মাঠও আছে। গাছও আছে দু'একটা। একটা গাছের তলাতেই বসেছিল সে। টোটো একটু দূরে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল। যখনই সে বিশ্রাম নেয় কোথাও, টোটো ঘুমোয়। হঠাৎ সামনের গাছে একটি পাখী এসে বসল। লেজটি উৎক্ষিপ্ত করে উড়ে গেল আবার। শাদায় কালোয় চমৎকার চেহারা। ওটা যে দোয়েল পাখী তা সে চিনত না। একটু পরেই কিন্তু মনে পড়ল সাতকড়ির কথা। সে যেন এই পাখীরই বর্ণনা দিয়েছিল। এই কি দোয়েল? তারপর হঠাৎ অপূর্ব সুর ভেসে এল তার কানে। দেখলে সামনের বাড়ীর ছাদে একটা বাঁশ রয়েছে, বোধহয় রেডিওর এরিয়েল, সেই বাঁশের উপর বসে গান গাইছে দোয়েল। অপূর্ব সে গান। অবর্ণনীয়। মনে হল সমস্ত পাড়াটা যেন স্বপ্ন দেখছে। সত্যেন একদৃষ্টে চেয়েছিল পাখীটার দিকে। তার এই একাগ্র দৃষ্টির আঘাত সহ্য করতে পারল না সে, উড়ে গেল। সত্যেন মুগ্ধ হয়ে বসে রইল। আশ্চর্য জিনিস একটা মনে হল তার। মনে হল—গুরু পেয়েছি। কবিতা জাগল মনে।

পথ আছে কোটি কোটি।
গুরুও অনেক।
সূর্য তো আকাশভরা।
পথহারা ফিরি তবু আমি।
যে গুরু দেখাবে পথ তার দেখা পেলাম না আজও।
একটিও সূর্য নাই আমার আকাশে,
ধ্রুব-তারা অস্তমিত।
সহসা দোয়েল পাখী বসিল আসিয়া
সামনের গাছটিতে
হয়তো দোয়েল,

আগে তো দেখি নি।
গাহিল অপূর্ব গান।
দোয়েলের ভাষা শিখিনি জীবনে।
তবু মনে হল বুঝিলাম মর্মবাণী তার।
সে যেন বলিয়া গেল,
যাই হোক, গান গেয়ে যাও।
গানই পথ, গানই গুরু।
গানই তো আলো
আরও বলে গেল--
গান গাই বলে বেকার নহি তো আমি।
গোলামি করি না কারও।
অনলস চেষ্টায় জাগ্রত করিয়া রাখি নিজের শক্তিকে।
উপার্জন করি নিজে,
নিজের সামর্থ্যে উড়ি নিজের ডানায়···

গাছে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল সত্যেন। হঠাৎ চমকে উঠে পড়ল। কানের পিছনে কি একটা কামড়ে দিয়েছে। তারপব ঘাড়েও কামড়াল। হাত দিয়ে দেখল লাল পিঁপড়ে। গাছে লাল পিঁপড়ে অনেক। কানে আর ঘাড়ে হাত বুলুতে বুলুতে দেখতে পেল পাশের বাড়ির জানলায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেশ ডাগর-ডোগর লাল-শাড়ি-পরা কিশোরী একটি। তাকে দেখেই জানলা বন্ধ করে দিল সে। সত্যেনের হঠাৎ মনে হল বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। অনেকক্ষণ থেকে তেষ্টা পেয়েছে। ওই বাড়িতে জল চাইলে দেবে কি? সজ্ঞান মনে জলের তাগিদ ছিল, কিন্তু নির্জ্ঞান মনে ছিল ওই কিশোরীটি। উঠে পড়ল।

বাড়ির সামনে গিয়ে কড়া নাড়তে লাগল। ভিতর থেকে সাড়া এল কাংস্যকণ্ঠে—অনেকক্ষণ কড়া নাড়বার পর।

'কে গো—কি চাই—'

'বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। জল দেবেন একটু ?'

খানিকক্ষণ কোন সাড়া-শব্দ নাই।

তারপর বারান্দার জানলাটা খুলল। জানলার সামনে এসে দাঁড়াল বাড়ির ঝিই বোধ হয়। মাথার চুল পাকা, গাছকোমর বাঁধা। হাতে একগ্লাস জল।

'ভদ্দরলোকের বাড়িতে কড়া নেড়ে কেউ জল চায় না কি। বেপাড়ার লোক এখানে এয়েছ কেন। তোমাকে তো দেখিনি কখনও।'

সত্যেন উত্তর দিল না, ঢক্‌ঢক্‌ করে খেয়ে ফেলল জলটা।

'এ পাড়ায় কি করছ।'

'আমি ভিক্ষে করে বেড়াই। নানা জায়গায় ঘুরতে হয়।'

'এখন তোমাকে ভিক্ষে দেবে কে। বাড়িতে কেউ নেই। সব আপিস গেছে। কপাট খুলতে মানা—চোর-ডাকাতের উপদ্রব—যাও তুমি—'

বাড়ির ঝি গেলাসটা নিয়ে দড়াম করে বন্ধ করে দিল জানলাটা। বন্ধ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রইল সত্যেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে টোটোও উঠে এসেছে তার সঙ্গে সঙ্গে। বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছে। সে-ও বারান্দা থেকে নেমে যাবে ভাবছিল এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে জানলাটা খুলে গেল একটু, তারপর একটা বিশ নয়া টক করে এসে পড়ল বারান্দায়। জানলার কপাট আবার বন্ধ হয়ে গেল।

সত্যেনের চোখে জল এসে পড়ল।

জল এল কেন ? জানে না কেন।

আবার একটু দূরে গিয়ে আর একটা গাছের তলায় বসেছিল। মনে হচ্ছিল সঙ্গোপনে তার জীবনে অনেক পরীই এসেছে, সঙ্গোপনেই চলে গেছে তারা। আজ একজন শুধু তার মূল্য নির্ধারণ করে দিয়ে গেল—বিশ নয়া। কবিতার ফুল ফুটতে লাগল মনে।

অতি সঙ্গোপনে আসে যে পরীরা
তাদের দেখিনি কভু। কেবল দেখেছি সেই চিহ্নগুলি
যেগুলি তাহারা রেখে গেছে, ফেলে গেছে—
সবুজ পাতায়—ফুলের পাপড়িতে—
কিম্বা কোনও সন্ধ্যায় স্বপনে।
চিহ্নের নিরিখে তাহাদের পাই।
আজিকার চিহ্ন বিশ নয়া।
বিশ নয়া বলিতেছে বাখানিয়া—
ভিখারী ভিখারী তুমি—পয়সার ভিখারী,
আর কিছু নও।
ওগো নবপরী, তোমার এ রায় মানিয়া নিলাম।
সন্তুষ্ট রব তাই নিয়ে।
এ জীবনে সমগ্রের স্বাদ পাইনি কখনও।
খুব কাছে আছে যারা
তারাও তো পরীর মতন
রহস্যের কুয়াসায় ঢাকা।
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চিহ্নগুলি দিয়ে
সৃষ্টি করি তাহাদেরও।
আমার জীবন তাই পরী-সমাকীর্ণ
অপরূপ রূপকথা-লোক।
অপেক্ষা করিয়া আছি
সত্যের স্বরূপ রূপকথা ভেদ করি
দেখা দিবে কবে······

আবার উঠে হাঁটতে লাগল।

পিছনে টোটো।

একটা গলি থেকে বেরিয়েই সে একটা ভিড়ের মধ্যে পড়ে গেল। মেলা বসেছে। হ্যাঁ, ফুটপাথেই মেলা বসেছে। তরকারির দোকান,

খাবারের দোকান, শরবতের দোকান, আর পুতুলের দোকান। নানা রকম পুতুল চতুর্দিকে। দূরে একটা নাগরদোলা ঘুরপাক খাচ্ছে। তাতে অনেক ছেলেমেয়ে। বাঁদরের নাচ দেখানো হচ্ছে এক জায়গায়। প্রচুর ভিড় সেখানে। বাঁদর কি করে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে তাই দেখে পুলকিত হয়ে উঠেছে একদল লোক। সিনেমার গান বাজাচ্ছে একটা পানওয়ালা লাউড স্পীকার দিয়ে। আর পুতুল। নানা রংয়ের—নানা মাপের—নানা রকম পুতুলকে ঘিরে নানা রকম লোকের ভিড়। ছেলে মেয়ে তো আছেই, বুড়োরাও আছে। পুতুলদেরও নানান ভঙ্গী। নানা চেহারা। লক্ষ্মী সরস্বতী শিব গণেশ তো আছেনই তার সঙ্গে আছেন প্যাঁচা, আরসোলা, টিকটিকি, চিনেবাদাম। মাটির পুতুল কিন্তু সব যেন জীবন্ত। নিঃশব্দও যেন শব্দ করছে। নিস্তরঙ্গের বুকেও যেন তরঙ্গ উঠেছে। যারা গোলমাল করছে চারদিকে—তাদের চেয়েও এরা যেন বেশী মুখর। মনে কবিতা জাগল। ভিড়ের মধ্যে সে একটা পুতুলের দোকানের পাশে বসে পড়ল ফুটপাথে।

…নিঃশব্দও শব্দ করে ভাই।
বুঝিলাম আজ—তারও আছে ছন্দ-তাল।
আছে রাগ, রাগিণীও আছে।
অনুমান-শ্রবণ-মঞ্চেতে শোনা যায় সে নিঃশব্দে।
দিন যবে শেষ হয় সন্ধ্যার আঁধারে,
ক্লান্ত বীণা নীরব যখন,
মুখর বাঙ্ময় যবে মৌন অবাক,
নির্নিমেষ নয়নও যখন দেখিতে পায় না কিছু,
সু-উচ্চ কণ্ঠও যবে পায় না কোন প্রকাশের ভাষা,
তখন নিঃশব্দ হয়ে আসে নিঃশব্দ-চরণে,
নিস্তব্ধ অন্ধকারে।
তার ছন্দ-লয়-তাল— তার রাগ-রাগিণী-মহিমা,

লক্ষ লক্ষ জোনাকীর নিঃশব্দ দীপ্তিতে হয় মূর্ত
অতীন্দ্রিয় অকর্ণগোচরে—
বর্ণনীয় নয় যাহা বাক্য-বন্দী কাব্যের ঝঙ্কারে……

মুগ্ধ হয়ে চেয়ে ছিল সে পুতুলগুলোর দিকে। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে টিকলুকে দেখতে পেল। পুতুল কিনছে। হাতে একটা থলি, তাতে পুতুল কিনে কিনে রাখছে। পাশে একটি রূপসী যুবতী মেয়ে, তারই ফরমাশ মতো পুতুল কিনছে টিকলু। টিকলু বিয়ে করেছে না কি? যদিও সে এতদিন আত্মগোপন করে চলছিল, কলেজ স্ট্রীটের ধার দিয়েও যায়নি, তবু টিকলুকে দেখে সে যেন মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিস দেখতে পেল। টিকলু প্রাণের বন্ধু ছিল তার। ভালো ছেলে ছিল না, পরীক্ষা দিতে বসে প্রায়ই টুকৃত, তবু পাস করতে পারত না। টুকতেও পারত না ভালো করে। দুবার বি-এ ফেল করেছিল। তবু ওকে ভালবাসত সত্যেন। ওর মধ্যে এমন একটা বলিষ্ঠ সপ্রতিভতা এমন একটা সরল আন্তরিকতা ছিল যে, ওকে ভাল না বেসে উপায় ছিল না। সবাই ভালবাসত ওকে।

ডাক শুনে টিকলু সবিস্ময়ে চেয়ে রইল সত্যেনের দিকে। চিনতে পারল না। সত্যেনের সারা মুখে গোঁফদাড়ি, মাথায় রুক্ষ চুল লম্বা লম্বা, মুখ শুকনো, চোখ কোটরগত। কলেজের সত্যেনের সঙ্গে এর কোন মিল নেই।

'আমাকে ডাকছেন?'

'হ্যাঁ। আমি সত্যেন, সতু—'

'সতু! সে কি—'

এক লাফে টিকলু এসে দাঁড়াল তার পাশে।

'তোর ব্যাপার কি বল দেখি। তোর মামার কাছে গিয়েছিলাম একদিন তোর খোঁজে। তিনি বললেন সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। কোথায় আছিস এখন?'

'সর্বত্র। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। ভিক্ষে করি।'

'বলিস কি!'

দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইল। কারো মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুল না কয়েক মুহূর্ত।

সত্যেন পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল এবার।

'ভিক্ষা করি আর কবিতা লিখি!'

'কবিতা লিখিস?'

'হ্যাঁ। একটা খাতা ফুরিয়ে গেছে। আর খাতা কিনিনি। মনে মনেই লিখি।'

'তুই তো আধুনিক কবিতা লিখতিস আমাদের কলেজের ম্যাগাজিনে। আমি বুঝতে পারতাম না সব। এখনও সেই রকম কবিতা লিখিস—?'

সত্যেন কবিতার খাতাটা বের করে দিলে তাকে।

'নিয়ে যা। পড়ে দেখিস। আমার সঙ্গে দেখা হবে কি না কে জানে। আমার স্মৃতি একটা থাকুক তোর কাছে—আমি চললাম—'

'থাম থাম। তোর নাগাল যখন পেয়েছি তখন তোকে ছাড়ছি না।'

টিকলু মেয়েটির কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল—'তুমি পুতুলগুলো নিয়ে চলে যাও। আমি আসছি একটু পরে। টাকা আছে তো?'

'টাকা তো আপনার কাছে। ব্যাগটা আপনাকে দিয়েছিলাম।'

'ও আই সি।'

পকেট থেকে একটা ব্যাগ বার করে দুটো দশ টাকার নোট দিলে সে মেয়েটিকে।

'তুমি পুতুলগুলো নিয়ে চলে যাও। আমি আসছি একটু পরে।'

তারপর সত্যেনের দিকে ফিরে বলল—'চল আমরা একটা চায়ের দোকানে বসি।'

একটা চায়ের দোকানে একটা কোণের টেবিল অধিকার করে

বসেছিল তারা। টিকলু চা টোস্ট কেক ওমলেট অর্ডার দিয়ে বললে—'তুই তো চপ ভালবাসতিস, চপ খাবি ? চপ পাওয়া যাবে এখন ?

দোকানী উত্তর দিলে—'একটু দেরি আছে। আধঘণ্টা পরে পাবেন। চপ গড়া হচ্ছে।'

'বেশ আমরা বসছি। বস—'

কোণের টেবিলে দুটো চেয়ারই ছিল। দুজনে দুটো চেয়ারে বসল। বেয়ারা টেবিলে চা টোস্ট কেক দিয়ে গেল। কেকটা নিয়ে উঠে পড়ল সত্যেন।

'এটা টোটোকে দিয়ে আসি—'

'টোটো কে ?'

'আমার বন্ধু।'

টোটো বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল উদ্‌গ্রীব হয়ে।

কেকটা ছুঁড়ে দিতেই গপ করে ধরে ফেলল সেটাকে।

সত্যেন ফিরে এসে দেখল টিকলু তার খাতার প্রথম পাতাটা খুলে ভুরু কুঁচকে বসে আছে।

'এ কবিতা তুই রাস্তা চলতে চলতে লিখেছিস ? এ তো সাংঘাতিক কবিতা দেখছি। এর মানে কি ?'

'ও কবিতাটা বাড়িতেই লিখেছিলাম। শেষের দিকের কবিতা-গুলো রাস্তায় লেখা—'

'কিন্তু এ কবিতার অর্থ কি !'

এই বলে টিকলু পড়তে লাগল—

'দ্বৈত-অদ্বৈতের দ্বন্দ্বে
শতভিষা-স্বাতী মেতেছিল মহানন্দে।
স্থবির ফানুসে আর নবীন বুদ্বুদে
বাধিল বিবাদ কালো কালো লঘু মেঘে
শ্রাবণের গোধূলিতে সহসা একদা।
তারপর তুমি এলে,

আমি তো ছিলামই।
তোমার চোখের ভাষা
আমার বুকের শ্লেটে যে গান লিখিল
তাহার উত্তর আমার দৃষ্টির প্লেন
কতবার গাহিল সখি লো,
তব যুগ্ম গিরিশিখরের উন্মুখ চূড়ায়,
ঘুরিয়া ফিরিয়া।
দ্বৈত-অদ্বৈতের সত্য
সমাধান হল না তো তবু—'

কবিতা পড়া শেষ করে টিকলু হাসি মুখে বললে—'এর উত্তরে আমারও কবিতায় বলতে ইচ্ছে করছে—

কিন্তু সবসুদ্ধ মিল এ কি হল দুর্বোধ্য হেঁয়ালি কহ কবিবর। দ্বৈত-অদ্বৈত সহ শতভিষা-স্বাতী, বুদ্বুদ, ফানুস, শ্লেট, প্লেন গিরি-শিখরের লেংগি শ্রাবণের গোধূলিতে কালো কালো মেঘ—এ কি এ দুষ্পাচ্য ছ্যাঁচড়া বানাইলে হে আজব চেফ্। হজম করিবে এরে যে ভীম ভবানী, তিনি তো সেকেলে দুর্গে বন্দী আজও, লয়ে তার ভস্ম কৌটটিরে। কাহার গুষ্টির পিণ্ডি চটকাইলে তুমি কহ কবিবর—'

বলেই হো হো করে হেসে উঠল সে। তারপর বলল—'নে খা। আর একটা অমলেট দিতে বলব?'

'না। তুই একটা কথা ভুলে যাচ্ছিস। যে কাঁচের গ্লাসটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে তারই ভাঙ্গা কাঁচগুলোর মধ্যে খুঁজেছিস তুই আগেকার গ্লাসটা। সেটা নেই, আছে টুকরোগুলো—either you accept them or reject them—আসল গ্লাস আর নেই।'

'আহা চটছিস কেন? এই আর একটা করে অমলেট আর কেক দাও—'

গব্ গব্ করে খেতে লাগল সত্যেন। খাওয়া শেষ করে বলল—'আমি কিন্তু ভাঙ্গা গ্লাস থাকব না। সাবেক গ্লাস হব। যে মন্ত্রবলে

সেটা হবে তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি রাস্তায় রাস্তায়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষ্যাপা যেমন পরশ পাথর খুঁজে বেড়িয়েছিল।'

টিকলু তার মুখের দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে চেয়ে বসে ছিল। কোন উত্তর দিলে না।

'অমন করে চেয়ে আছিস কেন?'

'তোর রোগটা কি ধরতে পেরেছি। আমাকেও ওই রোগে ধরেছিল—'

'রোগ? মানে?'

'ব্যাধি। আমরা কেউ নর্মাল নই। খেতে পাই না, ভোগ করতে পাই না, আমরা বঞ্চিত বুভুক্ষু পরশ্রীকাতর।'

'আমি ভিক্ষে করি বটে। কিন্তু খেতে পাই।'

'তোর চোখের দৃষ্টিতে লেখা রয়েছে তুই বুভুক্ষু। তোর কবিতা প্রমাণ করছে তুই রিরংসার ঘোরে প্রলাপ বকছিস। তোকে দোষ দিচ্ছি না, দেহের ক্ষুধা না মিটলে সবারই ওরকম হয়। যাদের হয় না, তারাই মহাপুরুষ। তারাই মহামানব, তারা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দলের। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষেরা তা পারি কি? পারি না। কাবু হয়ে পড়ি, কেতরে যাই। আমাদের ক্ষিধের সময় খাবার চাই, তা না পেলেই বখেড়া। আমিও বখেড়ায় ভুগেছি। আমি তোর মতন কবিতা লিখতাম না, রাস্তায় মেয়েমানুষ দেখে বেড়াতাম। কিন্তু আমি এখন সামলে গেছি, ক্ষিধে মিটিয়ে নিয়েছি। তুইও আয় আমার সঙ্গে তোর ক্ষিধে মিটিয়ে দেব—'

সত্যেন অবাক হয়ে চেয়ে ছিল টিকলুর মুখের দিকে।

'তুই চাকরি পেয়েছিস বুঝি। তোর বউ তো বেশ সুন্দরী দেখলাম—'

'রং! আমি চাকরিও পাইনি, ও আমার বউও নয়।'

'কি করিস তাহলে—'

'দালালি করি। মেয়েমানুষের দালালি। অনেক হোমরা-চোমরা

ধনী লোক লম্পট প্রকৃতির। কিন্তু বাইরে তাঁরা সচ্চরিত্র সেজে থাকতে চান। গোপন জায়গায় তাঁদের জন্য আমি ভালো ভালো মেয়েমানুষ যোগাড় করে দি। বেশ্যারাও ভালো খদ্দের পাওয়ার জন্যে উন্মুখ। তাই দু'দিক থেকেই আমি বেশ মোটা কমিশন পাই। চৌরঙ্গীতে গ্র্যাণ্ড হোটেলে থাকি। তুইও আমার কাছে আয়। তোর সব ক্ষিধে মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেব আমি।'

'আমি লম্পট নই টিকলু। আমার প্রিয়া বেশ্যা নয়।'

'মেয়েমানুষ তো?'

'তা যে কি তা তোমাকে বোঝানো যাবে না। তা বোঝবার বুদ্ধিও তোমার নেই।'

'মানছি, তোমার কবিতা বোঝবার বুদ্ধি আমার নেই কিন্তু কবিতার পিছনে কি আছে, কি তোমাকে নাচাচ্ছে তা আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি। আমার কাছে থাকবি চল দিনকতক, সব ঠিক হয়ে যাবে—আমার সন্ধানে ভালো ভালো মেয়ে আছে—উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, ক্লিওপেট্রা, তিলোত্তমা—নানারকম—'

'যে মেয়েটি তোমার সঙ্গে ছিল সে পুতুল কিনছিল কেন? তার ছেলেপিলে আছে না-কি।'

'না। কিনছিল ওর ভাই-বোনদের জন্যে। একগাদা ভাই-বোন আছে ওর। বিরাট সংসার। ও-ই তাদের পালন করে। ওর বাবুটি বেশ বড়লোক—'

সত্যেন সবিস্ময়ে চেয়ে রইল টিক্‌লুর মুখের দিকে।

টিক্‌লু বলতে লাগল—'অমন হাঁ করে' আছিস কেন। যা বলছি তা ফ্যাক্ট। তুমি ফিক্‌শনের জগতে বাস করছ। যদি বাঁচতে চাও ফ্যাক্‌টের সঙ্গে মুখোমুখি হও।'

'ফ্যাক্‌ট মানে কি নোংরামি?'

'নোংরামি কিনা জানি না। ফ্যাক্‌ট হচ্ছে আমরা সবাই পশু। আমাদের নানারকম ক্ষিদে আছে। সেগুলো আগে মেটানো

দরকার। সেটা মিটলে তবে অ-পশুসুলভ মহত্ত্বের কথা ভাবতে পারবি, তার আগে নয়। আগে ক্ষিধে-তেষ্টাগুলো মিটুক।'

'ননসেন্স। তোমার থিয়োরি নিয়ে তুমি থাক, আমি চললুম—'

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল সত্যেন। তার কেমন যেন ভয় করতে লাগল। মনে হল হঠাৎ সে যেন একটা ভাঙ্গনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। পালিয়ে না গেলে এখনই তলিয়ে যাবে।···

'কোথা যাবি।'

টিকলু হাত চেপে ধরল তার। এতে আরও ভয় পেয়ে গেল সত্যেন। তার অন্তরবাসী আর একটা সত্তা যেন বলতে লাগল— টিকলু যা বলছে, তা ঠিক। তুমি রাজী হয়ে যাও।

চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল সে।

টিকলু আবার বলল—'পাগলামি করিস না। চল আমার সঙ্গে। আমার ঘরটা বেশ বড়। সেইখানে তুই থাকবি—'

'কারো স্কন্ধে আমি থাকতে চাই না। আমি চললাম। হাত ছেড়ে দে—'

স্কন্ধে থাকবি কেন, পেইং গেস্ট হয়ে থাকবি। তোকে একটা চাকরি যোগাড় করে দেব আমি। অনেক হোমরা-চোমরা লোকের 'টাচ'-এ আমাকে আসতে হয়। সেদিনই তো একজন বলেছিলেন— ভাল একটা প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখতে চান—দুশো টাকা মাইনে দেবেন। সেটা আমি যোগাড় করে দেব তোকে। চল—'

'কি করতে হবে আমাকে?'

'তা আমি ঠিক জানি না। চিঠি-পত্তর লিখতে হবে। তাঁর বক্তৃতাও লিখে দিতে হবে হয়তো। অনেক জায়গায় বক্তৃতা দেন তিনি। একটা হাত-মুড়কুৎ সঙ্গী হতে হবে আর কি। সর্বোপরি তাঁকে খুশী রাখতে হবে।'

সত্যেনের মনে হল একটা অদৃশ্য জাল যেন ক্রমশ ঘিরে ধরছে তাকে। এতদিন সে চাকরিই তো খুঁজছিল। কত জায়গায় কত

দরখাস্ত করেছিল। এখন তার হঠাৎ মনে হল, না, আমি কারও দাসত্ব করতে পারব না। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আমি যে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছি তা অপূর্ব। যে পথের জনতা এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছে আমাকে অথচ আমার স্বাধীনতা হরণ করবার চেষ্টা করেনি সে পথকে আমি ত্যাগ করব না। ওই পথের স্রোতেই ভেসে বেড়াব। ঐ পথই হয়তো আমাকে কোনদিন স্বাধীন কাজ দেবে।

'না ভাই' ওসব আমার পোষাবে না। আমি চললাম—'

দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল সত্যেন। টোটো বাইরে কান খাড়া করে অপেক্ষা করছিল। সত্যেন রাস্তায় নামতেই তার পিছু পিছু চলতে লাগল।

'সতু, শোন শোন—'

টিকলুর গলা শোনা গেল। কিন্তু সত্যেন আর ফিরল না। ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে গেল। কিছু দূর গিয়ে দেখল মোটরের সারি। ট্রাফিক পুলিস আটকেছে। একটা মোটরের জানালায় একটা মেয়ের মুখ দেখা গেল। বৃদ্ধা। কিন্তু এককালে রূপসী ছিলেন মনে হয়। ধপধপ করছে রং, টানা টানা চোখ, মাথার শাদা চুলে সিঁদুর।

মা—

হাত পেতে তার কাছে দাঁড়াল সত্যেন। মহিলাটি একটি রেশমের থলি খুলে পঁচিশ নয়া দিলেন তাকে।

প্রণাম করে চলে গেল সত্যেন। খুঁজতে লাগল মোটরের সারির মধ্যে আর কোন মহিলার মুখ দেখতে পাওয়া যায় কিনা। সে বুঝেছে মেয়েরাই পয়সা দেয়। পুরুষেরা দেয় না। পুরুষদের মধ্যে কেউ উপদেশ দেয়, কেউ কোন কথাই বলে না। মেয়েরাই এই মেয়েরই, ভিখারীদের বাঁচিয়ে রেখেছে। হঠাৎ রাস্তার আলো নিবে গেল। মোটরের সারি অবলুপ্ত হল। লোড-শেডিং হচ্ছে আজকাল। অন্ধকারের মধ্যে সব যেন কিলবিল করতে লাগল পোকার মতো। ধীরে ধীরে সে-ও মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। রাতটা

কোথায় কাটাবে ? কাছাকাছি পার্ক আছে কি কোনও ? কিম্বা কারও বাড়ির বারান্দা ?

শুধু আলোই নিবে যায়নি। বৃষ্টিও হয়েছিল। দুটো প্রকাণ্ড বাড়ির মধ্যে একটা সঙ্কীর্ণ গলি ছিল, তারই ভিতর আশ্রয় নিয়েছিল সত্যেন। টোটোও বসেছিল গলির মুখটাতে। সমস্ত রাত ভিজেছিল দুজনে। সত্যেন ভিজতে ভিজতে ঘুমিয়েছিল। সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছিল, গলিটা দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছিল, তবু ঘুমিয়েছিল সে। চোখ বুজে শুয়েছিল এক ধারে, পাশ দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছিল, বৃষ্টির ছাট গায়ে লাগছিল, তবু ঘুমিয়েছিল সে। সমস্ত দিন ক্লান্ত ছিল, অত অসুবিধার মধ্যেও নিদ্রাদেবী কৃপা করেছিলেন তাকে।

সকালে রোদ উঠল। সত্যেন ঘুম থেকে উঠে দেখে রোদে চারদিক ঝলমল করছে। বেরিয়ে এসে রোদে বসল সে। গায়ের জামা-কাপড় ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে। রাস্তা দিয়ে লোক আসছে যাচ্ছে। আসা-যাওয়ার বিরাম নেই কারো। একটা আপাদ-মস্তক ভিজে অদ্ভুত মানুষ যে ফুটপাথে বসে আছে তা দেখে কৌতূহল জাগছে না কারো। সবাই তাকে দেখে দেখে চ'লে যাচ্ছে, কিন্তু থামছে না কেউ। সকলেই যেন গা বাঁচাতে চায়। সকলেরই ভাবটা যেন—কি কাজ বাবা ওকে ঘাঁটিয়ে? কি ফ্যাসাদে পড়ে যাবে কে জানে। হঠাৎ একটা চার-পাঁচ বছরের মেয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পরনে লালপাড় শাড়ি। বার বার খুলে যাচ্ছে শাড়িটা, বাঁ-হাত দিয়ে সামলাচ্ছে শাড়িটা, ডানহাতে একটা আধখানা খাওয়া পেয়ারা।

'আমার ছেলের বিয়েতে তুমি বরযাত্রী যাবে ?'

পুলকিত হয়ে উঠল সত্যেন। তার দেহমনের সুপ্ত আনন্দ যেন জেগে উঠল সহসা।

'নিশ্চয় যাব। কত দূর যেতে হবে—'

'ওই তো পাশের বাড়ি। বাবা, দাদা, ছটু, কমল কেউ যেতে

চাইছে না। সবাই বলছে কাজ আছে। বাবার আপিস, দাদার কলেজ, কমলের বাসন মাজা বাকী। কিন্তু আমার ছেলের বিয়েটি কি করে হয় তাহলে বল—। বরের সঙ্গে বরযাত্রী না গেলে কি বিয়ে হয়—'

'বেশ চল, আমি যাই। কখন যেতে হবে—'

'এখনই। দাঁড়াও, আমি বরকে নিয়ে আসি তাহলে।'

এক ছুটে চলে গেল সে সামনের বাড়িটায়। সোৎসুকে চেয়ে রইল সত্যেন। টোটো ঘুমুচ্ছিল, সে-ও উঠে বসল। সে-ও যেন টের পেয়েছিল নতুন রকম কিছু একটা হচ্ছে। একটু পরেই উলু-ধ্বনি শোনা গেল। তারপর দুটি মেয়ে ছোট্ট একটি কাঠের পালকি নিয়ে বেরিয়ে এল। পালকির ভিতর বর বসে আছে সাজ-সজ্জা করে। কাগজের ছোট্ট টোপরও আছে একটি তার মাথায়।

'বরযাত্রী, তুমি বরের সঙ্গে সঙ্গে এস—'

সত্যেন গেল তাদের পিছু পিছু। টোটোও গেল।

বেশীদূর নয়। পাশের বাড়ি। সেখানে যেতেই আবার উলুধ্বনি শোনা গেল। শাঁখ বাজাতে বাজাতে একটি হাসি-খুসী মেয়ে এসে কপাট খুলে দিল।

মুগ্ধ হয়ে গেল সত্যেন তাকে দেখে। রং ফরসা নয়, কিন্তু কি অপরূপ লালিত্য ফুটে উঠেছে মেয়েটিকে ঘিরে। মনে হল যেন মহাভারতের কৃষ্ণা।

'বরযাত্রী, তুমি বারান্দায় বস। তোমার খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি—'

যে মেয়েটি শাঁখ বাজাচ্ছিল সে হেসে বললে—'মা গো মা। এই বুঝি তোমার বরযাত্রী। কোথা থেকে জোটালে একে।'

'বাবা দাদা কমল কেউ আসতে রাজি হল না। ও আমাদের বাড়ির সামনে বসেছিল। ওকে বলতেই ও রাজি হয়ে গেল। খুব ভালো লোক। ওকে খেতে দাও—'

বাড়ির কপাট বন্ধ হয়ে গেল।

একটু পরেই শালপাতা নিয়ে প্রবেশ করল একটা চাকর।

'আরে এ যে একটা ভিকিরি দেখছি—'

পিছনে খাবার নিয়ে আর একজন দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল—'ভিকিরি হোক আর যাই হোক, ও বরযাত্রী এখন। দিদিমণি ওকেই খাবার দিতে বলেছে। পাতাটা পেতে দাও তুমি। এক গ্লাস জল নিয়ে এস—'

পাতার উপর ফুলকো লুচি, আলুর ছোকা, মাছের কালিয়া, ফিস্ ফ্রাই, চাটনি, দই, পায়েস, সন্দেশ আসতে লাগল একে একে।

টোটোও উদ্‌গ্রীব উন্মুখ হয়ে বসেছিল সামনেই। তাকে মাঝে মাঝে খাবার ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিল সত্যেন। প্রচুর খাওয়া হল।

ছোট্ট মেয়েটি বেরিয়ে এল।

'পেট ভরে খেয়েছো তো?'

'খেয়েছি। বিয়ে কখন হবে?'

'বিয়ে রাত্রে। লগ্ন সাতটার পর। এই নাও পান দু খিলি।'

পানও এনে দিল সে।

'সন্ধ্যের পর বিয়ে। তুমি এসো। আসবে?'

সত্যেনের ইচ্ছে হল বলে আসবে। কিন্তু ওই কালো মেয়েটিকে দেখবার পর থেকেই তার মনে যে অপূর্ব স্বপ্নলোক মূর্ত হয়ে উঠেছিল তার ভয় হতে লাগল। বেশী ঘনিষ্ঠতা করলে তা হয়তো ভেঙে যাবে। প্রতিমার ভিতর থেকে মাটি-খড় বেরিয়ে পড়বে হয়তো। এখানে না থাকাই ভালো।

'না, আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে। আমি আসতে পারব না বিয়েতে।'

'দাঁড়াও তোমাকে আর একটা জিনিস এনে দিচ্ছি।' মেয়েটি ছুটে গিয়ে দুটো লজেন্‌স নিয়ে এল। তারপর ফিস ফিস করে বললে—'মেয়ের মা হাড়কিপটে। লজেন্‌স দিয়ে তত্ত্ব করেছে।'

সত্যেন স্বর্গলোক থেকে বিদায় নিয়ে আনমনে চলেছিল রাস্তা দিয়ে। এই কলকাতা শহরে এরকম স্বর্গলোকও আছে তাহলে। হঠাৎ তার মনে হল নদীর উপরে যে সব ময়লা ভাসছে তাই দেখে আমরা ভুলে যাই নদীর গভীরে নির্মল স্বচ্ছ জল আছে। তার কেমন যেন বিশ্বাস হয়ে গেল—এ জাত মরবে না। তাকে বাঁচিয়ে তোলবার জন্য সঙ্গোপনে সঞ্জীবনী সুধা সঞ্চিত হয়ে আছে ঘরে ঘরে।

কিছুদূর গিয়ে দেখল গরুর গাড়ির সারি চলেছে। হঠাৎ একটা গাড়ির গাড়োয়ান চেঁচিয়ে উঠল।

'আরে সত্তুবাবু নাকি! মোচ-দাড়ি রেখেও ছিপাতে পারলেন না হামার কাছে।'

সত্যেন অবাক হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে।

'আরে হামি ভিকু আছে। আপনাদের কালেজে নোকর ছিলাম। আর নোকরি করি না, নিজের গাড়ি চালাই—'

দুহাতে রাশ টেনে সে থামিয়ে দিলে তার বড় বড় বয়েল দুটোকে।

'আইয়ে বৈট যাইয়ে—'

উঠে বসল সত্যেন। কিন্তু তার ভারি লজ্জা করতে লাগল। যার চক্ষে সে একদিন বাবু ছিল তার চক্ষে আজ সে এ কি দীনবেশে হাজির হল। গাড়ি চলতে লাগল। টোটো আসতে লাগল গাড়ির পিছু পিছু। সত্যেন কিছু না বলে চুপ করে বসে রইল।

ভিকু কিন্তু নীরব থাকবার লোক নয়।

'সত্তুবাবু, আপকা চেহারা কুছ দমক গিয়া। ক্যা বাত হ্যায়—'

মিছে কথা বলল সত্যেন।

'অসুখ করেছিল কিছুদিন আগে—এখনও তাই দুবলা আছি—'

'আচ্ছা করকে খানাপিনা কিজিয়ে, আউর ডনড বৈঠক। সব ঠিক হো যায়গা—'

চুপ করে বসে রইল সত্যেন।

'আপ কিধার যাইয়ে গা—'

সত্যেনের অস্বস্তি হচ্ছিল। বললো—'আমি চৌমাথাতেই নেমে যাচ্ছি। তুমি কোথা যাবে—'

'হাওড়া টিশন। মাল গোদাম—'

'আমি শ্যামবাজারে যাব। এইখানেই বাস পাব—' মিথ্যা ভাষণ করে একটু অস্বস্তি হতে লাগল। শেষে নেমে পড়ল সত্যেন। বলিষ্ঠ সরল লোকটার কাছে বসতে লজ্জা হল। গরুর গাড়ির সারি চলে গেল।

হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে সে আবার খালি জায়গা পেয়ে গেল একটা। তিনকোণা জায়গাটা রেলিং দিয়ে ঘেরা। রেলিংয়ের ভিতর একটা সমাধি বোধহয়। বুঝতে পারল না ঠিক কি। এক জায়গায় কিছু ফুল আর মালা রয়েছে দেখল। রেলিংয়ের ধারের চারপাশ সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো। সেখান দিয়ে লোক চলছে না। সেখানে গিয়ে বসল সত্যেন। রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে বসল। বসে আবিষ্কার কবল সেই কৃষ্ণা মেয়েটি এখনও তার মনের অলিন্দে যেন দাঁড়িয়ে আছে। নাগালের বাইরে। কিন্তু মনে হতে লাগল তার দিকেই চেয়ে আছে সে। যে মেয়েকে ভালো লাগে সে যেন মন থেকে যেতে চায় না। রিরংসা? না, না টিকলুর কথা সে মোটেই মানবে না। রিরংসা হয়তো আছে নেপথ্যে, কিন্তু রিরংসাই সব নয়। যে অবর্ণনীয় মাধুরী পুষ্পিত হয়েছে ওর সর্বাঙ্গে তা কেবল মাংস নয়, তা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, কিন্তু অলীকও নয়। তা ওর মনের দীপ্তি, তা ওর ব্যক্তিত্ব, তা অবাস্তব অথচ বাস্তব। হঠাৎ মনে হল সত্যিই ও যদি কাছে আসে? ওই অসীমাকে সে কি ধরতে পারবে? খুব যদি ছোট হয়ে আসে? না, তাহলেও পারবে না। তাহলে?

কবিতা জাগতে লাগল মনে।

অসীম হোয়ো না তুমি। নাগাল পাব না। অতিশয় সীমাবদ্ধ অতি ক্ষুদ্র হয়ে যাও যদি, তাহলেও পাব না তোমাকে। বেশী বাড়াবাড়ি হলে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। আমার চেতনালোক নয় ভূমা সম। নয় অতি বড়, অত্যন্ত ছোটও নয়, নয় তাহা আণুবীক্ষণিক। আকাশ প্রান্তর নদী পুষ্পিত বনানী আছে সেথা, এমন কি সমুদ্র পর্বতও আছে কিছু কিছু। লেক আছে, ঝরণা ঝরে। মরুভূমি আলোড়িত করি লু-রাক্ষসী মাঝে মাঝে প্রতপ্ত তাণ্ডব তোলে। মধ্যবিত্ত আমার চেতনালোক। ময়ূরপঙখীতে চেপে আসিবে কি সেথা তুমি? আস যদি মোর নদনদী, আকাশ-সমুদ্র তোমার সে ময়ূরপঙখীরে সমাদরে করিবে বরণ। আমি কিন্তু রব না সেথায়। আমার খুশীর ঝড়ে আমি উড়ে যাব সেই স্বপ্নলোকে —যেথা তব মাতৃভূমি, পিতৃভূমি, আদিভূমি, জন্মভূমি—যেথা তুমি ছিলে, কিন্তু নাই। খুঁজিব তোমাকে সেথা, কেবল খুঁজিব।

কবিতাটাই আচ্ছন্ন করে রাখল তাকে অনেকক্ষণ। হঠাৎ কিন্তু ভেঙে গেল সব। কে যেন তাকে চুলের মুঠি ধরে আছড়ে ফেলে দিল কোলকাতার রাস্তার উপর।

'আমাদের দাবী মানতে হবে—আমাদের দাবী মানতে হবে'—

বিরাট মিছিল চলেছে। এক হাতে পতাকা—আর এক হাত মুষ্টিবদ্ধ।

কে ওরা?

কোথায় চলেছে?

যে ওদের দাবী মানবে সে কোথায়? সে কি ওই ভোট-ভিখারী মন্ত্রীরা? না পুঁজিপতি কোনও বিরাট ধনী? ওরা কি আমাদের দাবী মেটাতে পারবে? আমার দাবী আমি ছাড়া আর কেউ কি মেটাতে পারে? হঠাৎ এই অসম্ভব অবাস্তব কথাটা ঘুরপাক খেতে লাগল

তাঁর মনে। মনে হল আমরা সব যেন সেই আলিবাবা নাটকের মর্জিনা। নাচবার জন্যে—জঞ্জাল খুঁজছি। জঞ্জাল না পেলে 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' গান গেয়ে নাচ দেখানো যায় না। এ দাবী কি মানুষ হবার দাবী? আদর্শ বাঙালী হবার দাবী? টিকলুর কথাটা আবার মনে পড়ল, ক্ষিধে না মিটলে মানুষ হওয়া যায় না। ক্ষুধার্ত মানুষরাই কেবল কি ছট্‌ফট করছে তাহলে চারদিকে? ক্ষুধার আগুনে আদর্শ, মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব, সব পুড়ে গেল? মনে হল ওরা যেন বলছে—

ছি ছি এত্তা জঞ্জাল বলেছিল নর্তকী মর্জিনা। সে মর্জিনা নাই আজ। নূতন যুগের মোরা নূতন মর্জিনা। ছন্দে তালে সর্বাঙ্গ দুলায়ে কহিতেছি—দাও, দাও কোথায় জঞ্জাল। জঞ্জাল না পেলে মোরা সবাই বেকার। জঞ্জালের মঞ্চে মোরা চাহি যে নাচিতে, জঞ্জালে অঞ্জলি ভরি চাহি যে পূজিতে জঞ্জাল-সম্রাটে। পরিচ্ছন্ন, সুপবিত্র তোমরা যাদের বল—তারা সব পৌরাণিক রূপকথা, চিরশিশু চিরমুগ্ধ অবাস্তব জীব। মোরা শিশু নই, বৃদ্ধ নই, যীশু নই। ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত মোরা। জঞ্জালেরই মাঝে খুঁজি খাদ্য, খুঁজি তৃপ্তি, খুঁজি মুক্তি, খুঁজি উন্মাদনা। আমাদের দাবী জঞ্জালের মাঝে মোরা খুঁজে পাব মোক্ষ-মণি। অকস্মাৎ মৃত আলিবাবা দেখা দিবে চাকরি-দাতারূপে, চাকরির লক্ষ মোহর ছুঁড়ে দিবে চারিদিকে, 'নাও নাও চাকরি নাও' এ নব চিচিং ফাঁক খুলে দিক পাষাণ-কপাট চাকরি-গুহার। প্রেক্ষাগৃহ হাততালি মুখরিত হোক……

সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সত্যেন। তার চোখের সামনে এক নূতন মিছিল চলছিল। ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকী সূর্য সেন বাঘা যতীন অরবিন্দ ব্রহ্মবান্ধব বিবেকানন্দ প্রফুল্লচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ—আরও কত লোক। সবাইকে চেনে না সে—জ্যোতিষ্কের মিছিল একটা—চারিদিক আলোয় আলো—ওই যে ভিড়ের মধ্যে রয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র, তর্ক করছেন যেন কার সঙ্গে—বঙ্কিমচন্দ্রও চলেছেন এক ধার দিয়ে

দৃঢ়পদে কোনও দিকে না চেয়ে। তন্ময় হয়ে বসে রইল সত্যেন। মনে হল সে যেন অন্য জগতে চলে গেছে।

কিন্তু কলকাতা শহর কাউকে বেশীক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে থাকতে দেয় না। গগন-বিদারী গর্জন করে একটা লরী এসে থামল। লরিতে বন্দুকধারী মিলিটারি রয়েছে। প্রত্যেকের পরনে খাকি পোশাক, হাতে বন্দুক। লরির পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে একটা অচল মোটরকার। কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ, ড্রাইভার সেলফ দিয়ে চলছে অবিরত, গাড়ি চলছে না। দুপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে জনতা। রাস্তা খুব চওড়া নয়। মোটর লরি এগুতে পারছে না। রাস্তার দুপাশে পশরা বিছিয়ে নির্বিকার বসে আছে হকারের দল। একটা লোক মাঝে মাঝে চেঁচাচ্ছে, ছে ছে পয়সা দু দু আনা। নানা রকম প্ল্যাসটিকের ছোট ছোট পুতুল, থালা, হাঁড়ি, গ্লাস, চামচে, পেয়ালা, ডিস স্তূপীকৃত রয়েছে তার সামনে। দুটো রিকশাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। একটাতে বসে আছে এক মাড়োয়ারী স্থূলকায়া বৃদ্ধা, অন্যটিতে চোং প্যাণ্ট পরা ছেলে একটি···

মিলিটারি লরি হর্ণ দিয়ে চলেছে, অচল মোটরকারের ড্রাইভার নেবে হ্যাণ্ডেল মারছে গাড়িতে, কিন্তু গাড়ি চলছে না। লরির পিছনে দাঁড়িয়ে গেছে মোটরের সারি, মাঝে মাঝে—ছে ছে পয়সা দু দু আনা—বিকট গর্জন করে একটা প্লেন উড়ে গেল। টোটো কিন্তু ভিড়ের মধ্যে যায়নি। দূরে সিমেণ্টের উপর কান-খাড়া করে বসে আছে চুপ করে। হঠাৎ কয়েকজন মিলিটারি জোয়ান লরি থেকে নেবে গেল। অচল মোটরকারটাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে রাস্তা থেকে। দেখতে দেখতে রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল। মেঘ কেটে বেরিয়ে পড়ল যেন নীল আকাশ।

সামনের ফুটপাথের উপর একটা শুকনো গাছের ডালে দুটি শালিক পাশাপাশি বসে আছে তাদের দেখা গেল। ভিড়ের গোলমালে এতক্ষণ ওদের দেখা যায়নি। বেশ নির্বিকার ভাবে বসে

আছে ওরা। সত্যেনের মনে হল—আহা মানুষ না হয়ে যদি পাখী হতাম। ফুরফুরে হাওয়া বইতে লাগল। 'ছে ছে পয়সা দু দু আনা' বলে যে ছোঁড়াটা চেঁচাচ্ছিল দেখা গেল সে-ও বিড়ি ধরিয়ে তার সঙ্গিনীর সঙ্গে হেসে হেসে গল্প জুড়ে দিয়েছে। তার পাশে যে একটি সঙ্গিনী ছিল এতক্ষণ দেখা যায়নি। সে ওই ভিড়ের মধ্যে কুঁকড়ে শুয়ে ছিল ফুটপাথেরই উপর। দু দিকে বেণী ঝোলানো ডগমগে ছিটের জামা পরা মেয়েটি ভারি সপ্রতিভ বলে মনে হল।

তারপরই ছুটতে ছুটতে এল একটা ছেলে, এসেই একটা বাড়ির পাঁচিল টপকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। তাব পিছু পিছু যারা ছুটে আসছিল তারা ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল। শোনা গেল খুন হয়েছে। এক পার্টির লোক আর এক পার্টির লোককে গুলি করেছে।

বাজারের থলি হাতে করে দুজন ফতুয়াপরা ভদ্রলোক সত্যেনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। একজন বেঁটে একজন লম্বা। দুজনেরই মাথায় টাক।—'বুঝলে গঙ্গা, সব পাগল হয়ে গেছে। একটা পাগল আর একটা পাগলকে খুন করছে।'

গঙ্গা বললেন -'পাগল হতে যাবে কেন। নেতায় নেতায় যুদ্ধ হচ্ছে, ছোঁড়াগুলো ওদের সোলজার। একদল মনে করছে বিপক্ষ দলকে যদি কাত করতে পারি তাহলে আমরা হু হু করে চাকরি পেয়ে যাব। উজির নাজির হয়ে যাব, চলতি বাংলায় একে বলে খেওখেয়ি।'

'না না, বুঝতে পারছ না, ওরা পাগলই হয়ে গেছে। ক্ষিধেয় পাগল। শুধু ক্ষিদে নয়। নানা অভাব পাগল করেছে ওদের। ওরা চাকরি পায়নি, বল পায়নি, শিক্ষা পায়নি, কিছু পায়নি। ওরা খালি কিলবিল করছে আর যখন তাও অসহ্য হয়ে উঠছে তখন হত্যা করছে পরস্পরকে। এতগুলো পাগলাকে কি কোন গভর্ণমেণ্ট সামলাতে পারে? পারবে না, সুতরাং এ চলবেই। এই গণ-আত্মহত্যা করে করেই সমাজ হয়তো হালকা হবে একদিন।'

গঙ্গা বললেন—'আরে তোমার বাজে ফিলজফি ছাড়, ওসব পার্টি পলিটিকস। এবার চল। আমাকে মেয়ের কাছে শ্যামবাজারে যেতে হবে—চল চল।'

ওঁরা চলে গেলেন।

বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল সত্যেন। সামনে একটা মোটর এসে দাঁড়িয়েছিল। সে মোটরের জানলায় যে মহিলাটি বসে ছিলেন তাঁর কাছে ভিক্ষে চাইলে ভিক্ষে পাওয়া যেত। তাঁকে দেখে মনে হয় উনি প্রত্যাখ্যান করবেন না। কিছু-না-কিছু দেবেনই। লোকের মুখ দেখে তার চরিত্র কি তা বোঝবার ক্ষমতা হয়েছিল সত্যেনের। কিন্তু হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল না। পকেটে পয়সা ছিল। পেটও ভরা। মোটর চলে গেল।

কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত রাস্তাটা আবার ফাঁকা হয়ে গেল।

ছে ছে পয়সা দু দু আনাও উঠে গিয়ে সামনের দোকানে চা খাচ্ছে। তার সঙ্গিনীটি দোকান আগলে বসে আছে। কি যেন খাচ্ছে মেয়েটিও, টোটোও তার পাশে গিয়ে বসেছে। মেয়েটির কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। একটি মা তার ছোট ছেলের হাত ধরে আস্তে আস্তে যাচ্ছে ওধারের ফুটপাত দিয়ে। ছেলেটির বেশ একটু ভব্যিযুক্ত ভাব। মা একটা তেলেভাজার দোকানে দাঁড়িয়ে কিছু তেলেভাজা কিনলেন। ঠোঙাটি ডান হাতে ধরে এগিয়ে গেলেন। একটু আগেই এখানে যে এত হই-চই হয়ে গেল তার চিহ্নমাত্র নেই। ক্লিন শ্লেট।

সত্যেনের মন কিন্তু নিষ্ক্রিয় ছিল না। তার মনে হচ্ছিল, একটু আগে সে যে জ্যোতিষ্কদের মিছিল দেখল—সেই মিছিল কোন্ দিকে গেল—কোথা থেকে এল। যাদের সে দেখল তারা কেউ তো এপারে নেই, সবাই তো ওপারে। এপারে ওপারে আনাগোনা আছে নাকি তাহলে? সে শুনেছে আছে। যতীনের মৃত মা তার কাছে আসত বার বার। যতীন মরেই গেল শেষে একদিন। সবাই বলল

তার মা তাকে নিয়ে গেছে। এপারে ওপারে আনাগোনা আছে এর প্রমাণ অনেক বিদ্বান লোকও নাকি পেয়েছেন। কিন্তু কোথায় সে ওপার ?

এপারে ওপারে আনাগোনা হয় শুনিয়াছি বহুকাল ধরে। সকলেই শুনিয়াছে। ওপার কোথায় ? দিকচক্রবাল রেখা ঘন বন সমাচ্ছন্ন। কখনও দেখায় মেঘ, কখনও কুয়াশা, কখনও পর্বতমালা, সন্ধ্যা উষা কখনও কখনও। অন্ধকার আলো দেখেছি ওপারে, দেখেছি নৌকাও। কিন্তু সে নৌকায় সে ওপারে যায় না তো, যাওয়া যে-ওপার ঠিকানা-বিহীন, যাহার ইশারা ভেসে আসে মাঝে মাঝে অনির্দিষ্ট পথ বেয়ে, সে-ওপার হয়তো বা আছে এপারেই, কিন্তু তবু অদৃশ্য যা, স্বতন্ত্র রহস্যলোকে অস্তিত্ব যাহার। শুধু জানি এপারে ওপারে আনাগোনা হতেছে সর্বদা··· ··

আরও একটা অবর্ণনীয় ভাব মনে জাগছিল, তাকে সে ভাষা দিতে পারলে না। তারপর হঠাৎ চমকে উঠল। ঢাক বাজাতে বাজাতে একদল লোক হাজির হল কোথা থেকে। কোন দিকে না চেয়ে ঢাক বাজাতে বাজাতে চলে গেল তারা। তাদের পিছু পিছু এল একটি য়িহুদী মেয়ে সাইকেল চড়ে। খুব রোগা, নীল রঙের ফ্রকপরা, কালো চুল কালো চোখ। চোখের দৃষ্টি কিন্তু বুদ্ধিশাণিত। সে-ও কোন দিকে না চেয়ে চলে গেল। তারপর এল একটা মোটর, তার পিছু পিছু আর একটা, তারপর আর একটা, আর একটা—মোটরের সারি জমে গেল আবার।

হঠাৎ সত্যেনের মনে হল আমি ওদের কেউ নই। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সেই কাঙালিনীর মতো সে-ও যেন ধনীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে।

'বাজিতেছে উৎসবের বাঁশী, কানে তাই পশিতেছে আসি, ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে, দুরাশার সুখের স্বপন······'

খুব জোরে ইলেকট্রিক হর্ণ দিয়ে এল একটা সবুজ রঙের ট্রাক, তার উপর বসে আছে একদল নগ্নগাত্র কুলী—কারও হাতে কোদাল, কারও হাতে গাঁইতি। কোথাও কাজ করতে যাচ্ছে ওরা। চলে গেল। সত্যেনের মনে হল আমি ওদের দলেও অপাঙক্তেয়, আমি কোদাল গাঁইতি চালাতে পারি না, আমি স্বপ্নসম্বল অপদার্থ জীব একটা। কিন্তু তাই কি ভ্রূ কুঞ্চিত করে সে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ সামনের ডাস্টবিনটার দিকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই টোটোর আর্তনাদ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। দেখল একটা বলিষ্ঠ কুকুর কামড়ে ধরেছে তাকে। আর সেই 'ছে ছে পয়সা দু দু আনা' লোকটা লাঠি নিয়ে মারছে ওকে। তাড়াতাড়ি ছুটে গেল সত্যেন। যখন গিয়ে পৌঁছল তখন বলিষ্ঠ কুকুরটাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে লোকটা। তবু সেটা দূরে দাঁড়িয়ে গজরাচ্ছে। আর টোটোর কান দিয়ে রক্ত পড়ছে, পিছনের পা দুটো থর থর করে কাঁপছে, তার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে সে তার লজ্জিত ল্যাজটা—

'টোটো, চল এখান থেকে যাই আমরা। আয়—' টোটোকে ধরে ধরে নিয়ে গেল সত্যেন।

হো হো করে হেসে উঠল সেই 'ছে ছে পয়সা দু দু আনা'।

'আয়া হে অব তেরা দোস্ত, খিলায়েগা রোটি গোস্ত-'

অপমানের চাবুকটা খেয়ে অপমানিত হল সত্যেন। পকেটে যদি যথেষ্ট পয়সা থাকত তাহলে সে সত্যিই গোস্ত রোটি কিনে এনে খাওয়াতো টোটোকে। কিন্তু পকেটে মাত্র চার আনা পয়সা আছে। কিছুদূর গিয়ে একটা ওষুধের দোকান দেখতে পেল।

'আমার কুকুরটার কানে আর একটা কুকুর কামড়ে দিয়েছে, রক্ত পড়ছে। একটু টিঞ্চার আয়োডিন লাগিয়ে দেবেন?'

'কতখানি নেবেন—'

জিগ্যেস করলে বাঙালী ছোকরাটি। কাউন্টারের এক কোণে বসে বসে সিনেমা-কাগজ পড়ছিল একটা। উঠবার ইচ্ছে ছিল না তার।

সত্যেন বলল—'তুলোয় একটু লাগিয়ে দিন না।'

'তুলোয়? তুলোয় লাগিয়ে আমরা বিক্রি করি না।'

এর পরে চলে যাওয়াই উচিত ছিল কিন্তু সত্যেনের মধ্যে কে একটা যেন ক্ষেপে উঠল।

বলল—'যতক্ষণ না দিচ্ছেন, ততক্ষণ আমি কুকুর নিয়ে আপনার ডিসপেনসারিতে বসে থাকব। আপনার ডাক্তারবাবু কখন আসবেন?

'সন্ধ্যের পর।'

'ততক্ষণ অপেক্ষা করব। আয় টোটো—'

টোটোকে নিয়ে ঢুকে পড়ল সে ডিসপেনসারির ভিতর।

'এ তো আপনার আচ্ছা জবরদস্তি মশায়।'

সত্যেন কোনও উত্তর না দিয়ে বসে পড়ল। টোটোও বসল তার পাশে।

'খুচরো তুলো বাইরে নেই। আমি কি নতুন প্যাকেট ছিঁড়ব আপনাব জন্যে? দাম দিন, ছোট প্যাকেট তুলো দিচ্ছি একটা। আয়োডিন নিয়ে যান—এক ড্রাম—'

'পয়সা বেশী নেই আমার। মাত্র চার আনা আছে, ওতে হবে কি?'

'না—'

'তাহলে আমার এই কাপড় থেকে ছিঁড়ে দিচ্ছি খানিকটা। তাতে আয়োডিন ভিজিয়ে দিন একটু। সেইটেই লাগিয়ে দিই।'

'তা কি হয়, আপনি পাগলের মতো কথা বলছেন যে। যান এখান থেকে—'

'যাব না। ডাক্তারবাবু আসুন, তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাব।'

'এ তো মহাবিপদ দেখছি!'

তারপর গলাটা চড়িয়ে বললে—'আপনি যাবেন না? পুলিস ডাকব নাকি?'

'ডাকুন।'

ঠিক এই সময় খাকি হাফ্‌প্যান্ট-গেঞ্জি পরা একটি ছেলে ডিসপেনসারির সামনে এসে দাঁড়াল।

'কি হয়েছে মাণিকদা—'

'একটা বদমাইস লোকের পাল্লায় পড়েছি—'

'কি হয়েছে—আরে একটা কুকুর রয়েছে এখানে দেখছি। কান দিয়ে রক্ত পড়ছে কেন?'

সত্যেনই তাকে সব কথা খুলে বললে।

'আমি গরীব মানুষ। আমার কাছে পয়সা নেই। ওঁকে বলছি একটু টিঞ্চার আয়োডিন তুলো দিয়ে লাগিয়ে দিন, আমি চার আনা পয়সা দেব। তা উনি দিচ্ছেন না, তাই বসে আছি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করব বলে।'

'ও, এর জন্যে আর ভাবনা কি। আমি এখনই এনে দিচ্ছি। আমাদের বাড়িতে তুলো, আইডিন, ব্যাণ্ডেজ সব আছে—'

এক ছুটে চলে গেল ছেলেটি।

তারপর ছুটতে ছুটতে ফিরে এল আবার।

'আপনি আমার বাড়িতে আসুন। দিদি কুকুরটা দেখতে চাইছে। দিদি কুকুর বড় ভালবাসে। আসুন না—'

গেল সত্যেন ছেলেটির পিছু পিছু। পাশেই বাড়িটা। সেখানে গিয়ে দেখল একটা সুঁটকো লম্বা হাড়-গিল-মার্কা মেয়ে পিঠকাটা ব্লাউজ পরে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা লম্বাগোছের, কোন লালিত্য নেই। টোটোকে দেখে সে মুখ বেঁকিয়ে বলে উঠল—'ওমা, এই রাস্তার নেড়ি কুত্তোর জন্যে টিঞ্চার আয়োডিন চাই—'

বলেই সে এক ঝটকায় ভেতরে ঢুকে গেল। ছেলেটাও ঢুকে পড়ল তার পিছু পিছু। একটু পরেই টিঞ্চার আয়োডিনে তুলো ভিজিয়ে বেরিয়ে এল সে।

টোটো কিন্তু টিঞ্চার আয়োডিনে আপত্তি জানাল। একবার

লাগাতেই ঘেউ ঘেউ করে উঠল। তারপর দূরে সরে গেল।

সত্যেনের মনে হল টোটোর আত্মসম্মানবোধ আমার চেয়ে বেশী সজাগ। অবজ্ঞার দান ও নেবে না। বেশ একটু দূরে গিয়ে সে উবু হয়ে বসেছিল আবার। ঘাড় ফিরিয়ে দেখছিল সত্যেন আসছে কিনা। সত্যেন দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল তার পাশে। টোটোকে সম্বোধন করে বললে—'ওষুধ লাগালি না, ঘা-টা যদি সেপ্‌টিক হয়ে যায়—'

টোটো ল্যাজ নাড়তে লাগল।

'চল এবার খাওয়ার ব্যবস্থা করা যাক্। কি খাবি ?'

টোটো ল্যাজ নাড়তে লাগল।

'রোক্‌কে—রোক্‌কে—রোক্‌কে।'

একটা ট্যাকসি এসে দাঁড়াল। ট্যাকসি থেকে নামলেন এক শীর্ণ ভদ্রলোক, এক স্থূলকায়া মহিলা আর পাঁচটি ছেলেমেয়ে। কেরিয়ার থেকে জিনিসও নামাল নানা রকম। একটি সুটকেস, একটি পুঁটলি, একটি ব্রিফকেস, টিফিন কেরিয়ার, একটা ঝোলা, তাছাড়া আরও অনেক টুকিটাকি। ট্যাক্সিকে ভাড়া দেবার সময় ভদ্রলোক বললেন—'এই গলির ভিতর আমার বাড়ি, নিয়ে চল না বাবা গাড়িটা—'

গাঁউ গাঁউ করে পাঞ্জাবী ড্রাইভার সর্দারজি বললেন—'ই চোট্টা ডাকুকা মহল্লা হ্যায়, গলি-ওলি মে নেহি যায়েঙ্গে—'

শীর্ণ ভদ্রলোক আর পীড়াপীড়ি করতে সাহস করলেন না। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। ট্যাক্সি চলে গেল।

শীর্ণ ভদ্রলোক অসহায় ভাবে চারদিকে চেয়ে বললেন, 'মুশকিলে পড়া গেল। এতগুলো জিনিস এখন নিয়ে যায় কে। ঘরে তো তালা দিয়ে বেরিয়েছিলাম, ঝি-মাগী এখনও আসেনি নিশ্চয়। এখানে কুলিও তো দেখছি না একটাও—'

সহসা সত্যেন এগিয়ে এল।

'আমি নিয়ে যাচ্ছি আপনার জিনিসগুলো। তবে সবগুলো এক-সঙ্গে পারব না। একে একে নিয়ে যাব। কতদূর আপনার বাড়ি—'

'এই গলিতে ঢুকেই অল্প দূর।'

'আমি এই স্যুটকেসটা আগে পৌঁছে দিয়ে আসি। আপনারা একজন এখানে দাঁড়ান। আর বাকি সবাই চলুন আমার সঙ্গে—বাড়িটা দেখিয়ে দিন।'

দেখা গেল স্থূলকায়া গৃহিণীটির দেহ স্থূল বটে, কিন্তু বুদ্ধিটা সূক্ষ্ম।

'তুমি বাপু কত নেবে সেইটি বল আগে।'

'যা দেবেন তাই নেব।'

'চার আনার বেশী দিতে পারব না।'

'বেশ তাই দেবেন।'

ভদ্রলোক জিনিস পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সত্যেন স্যুটকেসটা মাথায় তুলে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। ভদ্রলোকই সাহায্য করে সেটি মাথায় তুলে দিলেন। সত্যেন বুঝতে পারল বেশ ভারী স্যুটকেসটি। ভিতরে পাথর আছে নাকি! ঘাড়টা থরথর করতে লাগল তার। তবু অতিকষ্টে আস্তে আস্তে সে অনুসরণ করল তাদের, স্যুটকেসটাকে দুহাতে চেপে ধরে।

অনেক দূর যেতে হল গলির ভিতর। ছোট একতলা বাড়ি। তার কপাট খুলতেই বেশ দেরি করলেন ভদ্রমহিলা। সত্যেনের ঘাড়টা থরথর করে কাঁপছে। কপাট খুলে ঘরের ভিতর ঢুকে ভদ্র-মহিলা বললেন—'নিয়ে এস ভেতরে। ওই বেঞ্চির উপর রেখে দাও।'

একদিকে একটা বেঞ্চি ছিল।

'আপনি একটু ধরুন। আমি নামাতে পারব না—'

'আবার ধরতে হবে নাকি! দাঁড়াও দাঁড়াও, ফেলে দেবে দেখছি—'

ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি গিয়ে ধরলেন স্যুটকেসটা। কোনক্রমে নাবানো হল।

'যাও বাকি জিনিসগুলো নিয়ে এস এবার। উঃ, ঘরে যা ধুলো

জমেছে। ঝিটা কখন যে আসবে কে জানে।'

সত্যেন বেরিয়েই দেখে টোটো দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছে।

'কি রে তুইও এসেছিস? চল।'

বারচারেক যাতায়াত করে সব জিনিসগুলো নিয়ে এল সত্যেন। টোটোও প্রতিবার তার সঙ্গে গেল আর এল।

শীর্ণকান্তি ভদ্রলোক পকেট থেকে ব্যাগ বার করে' বললেন—'কত দিতে হবে তোমাকে—'

থলথল করে এগিয়ে এলেন তার গৃহিণী।

'সে আমি আগেই ঠিক করে নিয়েছি। চাব আনা দিয়ে দাও—'

চার আনা!

শীর্ণ ভদ্রলোক নিজেই কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন প্রস্তাবটা শুনে।

চার আনা! চাব আনা মজুরী আজকাল আছে নাকি!

গিন্নীর দিকে আড়চোখে চেয়ে একটা টাকা দিলেন সত্যেনকে।

'তোমার সবতাতেই বাহাদুরি। দাও যথাসর্বস্ব দিয়ে দাও ওকে—'

গৃহিণী দুই হাতে যথাসর্বস্ব দেবার ভঙ্গী করে এবং হাতভরতি সোনার চুড়িতে ঝনৎকার তুলে ভিতরের দিকে চলে গেলেন।

ভদ্রলোকও গেলেন ভিতরে। সত্যেন এগিয়ে গিয়ে গলির মোড়ে দাঁড়াল আবার। ভাবছিল কোন্ দিকে যাবে।

'ওহে, শোন শোন—'

শীর্ণ ভদ্রলোক তার দিকেই এগিয়ে আসছেন হন্‌হন্ করে।

'ওহে শোন, তুমি আমার ঘরদোরগুলো ঝাড়ু দিয়ে দেবে? আমরা কাশ্মীর গিয়েছিলাম কিনা, বাড়িতে ঝাড়ু পড়েনি অনেকদিন। টিফিন কেরিয়ারের বাটি চারটেও মেজে দিতে হবে। পারবে তুমি?'

'পারব। কত মজুরি দেবেন?'

'কত নেবে বল না—'

'আরও দু'টাকা দিতে হবে—'

যদিও সত্যেন এর আগে এসব করেনি কখনও, তবুও অপটু হস্তে

সে সবই করে ফেলতে পারল শেষ পর্যন্ত। একটা অদ্ভুত আনন্দ হচ্ছিল তার। সে যে অকর্মণ্য নয়, সে যে কাজ করে রোজগার করতে পারে এই অনুভূতিটা সুরার মতো সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছিল তার দেহেমনে। স্থূলকায়া ভদ্রমহিলা যদিও বকছিলেন তাকে তার অপটুতা দেখে, তবু তাঁর বকুনির মধ্যেও একটা মমতার সুর বেজে উঠছিল যেন মাঝে মাঝে।

'কাজের ছিরি দেখ না! আরে ধুলোগুলো ওইদিকে নিয়ে যাচ্ছ কেন—কপাটের দিকে নিয়ে এস। বাইরে ফেলতে হবে তো। বোকারাম একটি। কি করে ঘর ঝাড়ু দিতে হয় জান না?'

'আমি এ কাজ আগে কখনও করিনি মা। বাবু বললেন তাই করে দিচ্ছি। ঠিক করে দেব সব, দেখুন না—'

'আর তুমি করেছো!'

'ঠিক করে দেব দেখুন—'

পাশের ঘরে ছেলেমেয়েগুলো চ্যাঁ-ভ্যাঁ শুরু করছিল ক্ষিধের জ্বালায়। গিন্নী গেলেন সেদিকে। তারপর এসে বললেন—'তুমি দেখ তো বাবা, উনি কোথায় খাবার আনতে গেলেন। যেখানে যাবেন সেইখানেই তো বাঘের মাসী হয়ে যাবেন। খাবারওলার সঙ্গে হয়তো গল্প জুড়েছেন—তুমি একবার দেখ তো—ছেলেমেয়েগুলো ক্ষিধেয় আনচান করছে।'

সত্যেন বেরিয়েই দেখল শীর্ণকান্তি ভদ্রলোক একঝুড়ি খাবার নিয়ে আসছেন।

সত্যেন কাজকর্ম সেরে দুটি টাকা নিয়ে যখন চলে যাবার উপক্রম করছে তখন স্থূলকায়া মহিলাটি এলেন আবার।

'নাও তুমিও একটু খাও। তোমার মুখটিও শুকিয়ে গেছে।'

একটি কচুরি এবং আধখানি জিলিপি তাকে দিলেন। টোটো বাইরে রাস্তায় বসে ছিল, সত্যেন তার দিকে আধখানা জিলিপি ছুঁড়ে দিয়ে কচুরিটা মুখে পুরে ফেললে।

'ওকি, ছুঁড়ে ফেলে দিলে কেন জিলিপি ?'

'আমাব বন্ধু একটি কুকুর বাইরে বসে আছে, তাকে দিলাম।'

ভদ্রমহিলা গালে হাত দিয়ে বললেন—'ওমা কি কাণ্ড! আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে—এ যে সেই বৃত্তান্ত দেখছি—'

'চললাম আমি—'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। খেয়ে যাও একটা জিলিপি।'

এবার একটা গোটা জিলিপিই এনে দিলেন তিনি।

'খাও। আমার সামনে দাঁড়িয়ে খাও। তোমার যে রকম মতিগতি দেখছি তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার মনে হচ্ছে—'

মুচকি হেসে সত্যেন বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় যেতে যেতে তার মনে হতে লাগল, তার ভিতরে কার যেন আবির্ভাব হয়েছে। কার ?

বুঝতে পারছে না ঠিক। মনের ভিতর অন্ধকারও প্রচুর। দেখা যাচ্ছে না তাকে। হঠাৎ অস্ফুটকণ্ঠে সে বলে উঠল একবার—'কে তুমি—কে—কে।' তারপর থেমে যেতে হ'ল। একদল বাঁকওয়ালা তার পথরোধ করেছে। বাঁকের দুধারে বড় বড় ড্রাম ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে একদল বলিষ্ঠ লোক। ড্রামে কি আছে?—দুধ? একজনকে জিগ্যেস করলে—সে জবাব দিলে না কিছু। কলকাতার রাস্তায় সবাই পাশাপাশি চলেছে, কেউ কারো বিষয়ে কিচ্ছু জানে না। পরস্পর পরস্পরের দিকে যে দৃষ্টিতে চাইছে তাতে ফুটে উঠেছে অবিশ্বাস, সন্দেহ, ভয় আর হিংসা।

দাঁড়িয়ে রইল সত্যেন। টোটোও তার পাশে এসে দাঁড়াল। ল্যাজ নাড়তে লাগল। টোটো কারণে-অকারণে ল্যাজ নাড়ে।

বাঁকীরা চলে গেল। তারপর গান করতে করতে চলে এল একদল মাড়োয়ারি মহিলা। তাদের মুখ ঢাকা, কিন্তু কণ্ঠস্বরে চতুর্দিক নিনাদিত।

দাঁড়িয়ে রইল সত্যেন।

উদ্বেলিত হয়ে উঠল মনে একটা কবিতা।

তার মনের অন্ধকারে সেই বিরাট আবির্ভাব তখনও অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অন্ধকার যবনিকা-পারে কে তুমি দাঁড়ালে এসে? ডাকিলাম সাড়া তো দিলে না। মনে হয় আমাকেই ডাকিতেছ তুমি নীরব ভাষায়।

মর্মস্পর্শী সুতীক্ষ্ণ সে ভাষা, মূর্তিমতী বেদনার নিস্তব্ধ বিলাপ। সে-ডাকে দিতেই হল সাড়া।

বাহিরিনু অন্ধকারে কপাট খুলিয়া।
দেখিলাম অন্য কেহ নাই।
আমিই দাঁড়ায়ে আছি।
সেই আমি, যে-আমি বাহিরে সূচীভেদ্য অন্ধকারে
চির-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি,
ভিতরের আমির লাগিয়া।
বাহিরের 'আমি' নিঃশব্দে নিরন্তর ডাকিতেছে
ভিতরের আমিটারে।
অথচ দু-জনে দেখা হল না এখনও।
আজ দেখা হল যদি, দুজনের মাঝে দুলিতেছে
আঁধারের কালো যবনিকা।
কেন—কেন—কেন—!

অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল সত্যেন।

'এই শুয়োরকা বাচ্ছা, মরতে চাও নাকি—'

ক্যাঁচ করে একটা প্রকাণ্ড মোটর ব্রেক কষল।

প্রকাণ্ড জুলফিদার হামদো-মুখো ড্রাইভার একবার তার দিকে অগ্নি-দৃষ্টিতে চেয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল আবার। সত্যেন বেঁচে গেল। অপ্রস্তুত মুখে ওপারের ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াল সে।

টোটোও এল এবং উৎসুক দৃষ্টিতে চাইল তার দিকে। মনে হল টোটো একটু যেন চিন্তিত হয়েছে তার জন্যে।

গালাগালি খেয়ে কবিতার ঘোরটা কেটে গিয়েছিল তার। তবু মনের মধ্যে কেমন যেন একটা আনন্দ হচ্ছিল। পরিশ্রম করে সে আজ তিন টাকা রোজগার করেছে। এই আনন্দে তার সমস্ত মনটা যেন বিভোর হয়ে গিয়েছিল।

নাঃ—আর ভিক্ষে করব না। রোজগার করব। যেমন করেই হোক করব। হঠাৎ প্রতিজ্ঞা করে ফেলল।

রাস্তা দিয়ে আবার বাস, ট্রাক, টেমপো, মোটর, রিকশা, ঠেলার সারি চলতে শুরু করেছিল। আবার দু'পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে বিচিত্র জনস্রোত। এর মধ্যে সে কর্মী বাঙ্গালী একজনকেও দেখতে পেলে না। যারা কাজ করছে তারা প্রায় অবাঙালী। সমস্ত বাঙালী জাতটা হয় বন্দী হয়ে আছে আপিসে আপিসে, না হয় বেকার হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে! কিম্বা নাচ গান খেলা আড্ডা নিয়ে, না হয় পলিটিকাল পার্টিতে ঢুকে খুনোখুনি করছে। ওরা অসহায়, ওরা জানে না ওরা কি করছে; জানে না যে নানারকম পরাধীনতার গ্লানিতে আষ্টেপৃষ্ঠে ওরা বাঁধা তাই ছট্‌ফট করছে, তাই নানারকম পোশাক পরে, নানা ধাঁচের চুল-দাড়ি-গোঁফ জুলফির বাহার দেখিয়ে নিজেদের ভুলিয়ে রাখতে চাইছে ওরা। ওরা অসহায়। বড্ড অসহায়। ওদের বাঁচাতে হবে। কে বাঁচাবে? আমি। আমি আগে নিজে বাঁচব, তারপর ওদের বাঁচাব।

হঠাৎ সব অবলুপ্ত হয়ে গেল। আলোকিত হয়ে উঠল চতুর্দিক। সত্যেন দেখল সেই জ্যোতিষ্কদের মিছিল আবার আসছে। তার দিকেই আসছে। সামনেই রয়েছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁর দুপাশে দুটো সায়েব। চিনতে পারল সত্যেন—ছবি দেখেছিল। একজন এডিসন, একজন ফোর্ড। সকলেই উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তার দিকে। তারপর হঠাৎ একটা গুঁতো লাগল পিছন দিকে।

ঘেউ ঘেউ করে উঠল টোটো। সত্যেন ঘাড় ফিরিয়ে দেখল

প্রকাণ্ড একটা ষাঁড় তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে।

নির্বিকার নন্দী মহারাজ একটি। সরে গেল সত্যেন। তারপর হনহন করে হাঁটতে লাগল।

অনেক দূর হেঁটে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল সে। সামনে দেখতে পেল একটা দোকানে গরুর মাংস টাঙানো রয়েছে। টোটো কই? দেখল টোটো ঠিক পিছনেই রয়েছে।

'গোস্ত রোটি খাবি টোটো? আজ তোকে গোস্ত রোটিই খাওয়াব। পকেটে পয়সা আছে। ও লোকটা তখন ঠাট্টা করেছিল, ভেবেছিল গোস্ত রোটি খাওয়াতে পারি না তোকে। আয় খাওয়াব। চল—'

এক টাকায় বেশ খানিকটা মাংস পাওয়া গেল। পাশের দোকানে রুটিও পাওয়া গেল একটা। টোটো মহানন্দে খেতে লাগল।

॥ ৮ ॥

সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে বেড়াল সত্যেন। অনেক করুণাময়ী রমণীর মুখ দেখতে পেল সে মোটরের জানালায়। ভিক্ষা চাইলে ভিক্ষা পেত। কিন্তু হাত বাড়ায় নি সে একবারও। প্রতিজ্ঞা করেছে আর ভিক্ষা করবে না। ক্ষিদেয় কিন্তু পেট জ্বলছে।

টোটো পিছনে পিছনে ঘুরছে শুষ্কমুখে।

মানিকতলা বাজারের উত্তরদিকে দাঁড়িয়েছিল সে। সামনেই বাজারে ঢোকবার গেট।

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঢুকতে হয়, সোজা ঢোকা যায় না।

সামনেই ফলওলা বসেছিল একটা। লেবু আর কলা নিয়ে। তার পাশে তরকারিওয়ালি একজন। তার পাশে ছুরি-কাঁচি। তার পাশে জটলা করছে কতকগুলো চোং-প্যাণ্ট-পরা ছেলে, হাসাহাসি করছে; অঙ্গ-ভঙ্গী করছে—উপলক্ষ্য একটি কিশোরী মেয়ে, সে একটু দূরে একটা দোকানে কি যেন কিনছে। তার পাশে বসে রয়েছে

কতকগুলো ঝাঁকামুটে। কতকগুলো কদর্য চেহারার লোক মাথার পাগড়ি খুলে তাই দিয়েই হাওয়া করছে নিজেদের। দরদর করে ঘাম ঝরে পড়ছে কপাল থেকে, ঘাড় থেকে।

তাদেরই কাছে গেল সত্যেন। একজনকে বললে—'এ ভেইয়া, হামরা একটো উবকার কবনে শেকে গা ?'

'ক্যা, কহিয়ে।'

'হাম মোটিয়া হোনে মাংতে হেঁ।'

'সেকিয়ে গা ?'

'হাঁ, জরুর—'

'তব একটো ঝাঁকা খরিদকে বৈঠ যাইয়ে হিঁয়া। কি বাজারকা ভিতর ঘুস যাইয়ে। কুছ না কুছ মিল যায় গা—'

'ঝাঁকা তো নেহি হ্যায়। কাঁহা মিলে গা ?'

'শিয়ালদ!'

'দাম কেতনা লেগা ?'

'আচ্ছা ঝাঁকা চার পাঁচ রূপেয়া লাগ যায় গা—'

'ওতনা পয়সা তো নেহি হ্যয়।'

আর একটা ছোকরাগোছের ঝাঁকাওলা হেসে বলল—'তব রাস্তা মে টহলিয়ে—'

প্রথম ঝাঁকাওলাটি কিন্তু একটু আগ্রহান্বিত হল ওর সম্বন্ধে।

'পহলে আপ কেয়া কাম করতে থে।'

'কুছ নেই। কলেজ মে পড়তে থে। নোকরি নেহি মিলা। আব ঠিক কিয়া হায় মুটিয়া গিরিমে লগ যায়েঙ্গে—'

'ঘর মে কোই নেহি হ্যায় ? বাপ মাই, মামা চাচা—'

'মামা হ্যয়। মগর হুঁয়া সে হাম ভাগকে চলা আয়া। নোকরি নেহি মিলা, বড়া লাজ লাগতা থা—'

স-সম্ভ্রমে বলে উঠল ঝাঁকা-ওলা—'কালিজ মে পড়তে থে ? মোটিয়া হোনে মাংতে হেঁ!'

'হরজা কিয়া। ফির আচ্ছা কুছ মিল যায়গা তো করেঙ্গে—'

সেই ছোকরাটা বললে—'ঝাঁকা লাইয়ে পহলে—'

সত্যেন হেসে বললে—'ঝাঁকা কিননে কা পয়সা ভি রোজগার করনে পড়ে গা ভাই।'

প্রথম ঝাঁকা ওলাটি ধমকে দিলে ছোকরা ঝাঁকাকে।

'বইঠো বাবু।'

একটু সরে বসল সে।

'হমকো বাবু নেই কহিয়ে। হম তুমহারা ভাই হুয়। ছোটা ভাই। কুছ উপায় কর দিজিয়ে।'

'বৈঠিয়ে—'

তারপর সে পাশের লোকটাকে বলল—'নাগিনা তো বেমার বা। ওকরা ঝাঁকা কাঁহা?'

'হমারা পাশ—'

উত্তর দিলে একটা রোগা-গোছের লোক।

'দে—দে উঠো বাবুয়া কো—'

'আগর লেকে ভাগে—'

'নেহি ভাগে গা। হম জামিন রহা—লাও ঝাঁকা—'

একটু পরেই ঝাঁকা এসে গেল একটা।

'অব চলিয়ে বাজার কা ভিতর—'

নিজেও উঠে দাঁড়াল সে। প্রৌঢ় বলিষ্ঠ ব্যক্তি। পা দুটো ফাটা ফাটা। কাঁচা-পাকা গোঁফ। ঘাড়টা একদিকে একটু কাত-করা।

মাথায় পাগড়িটা বেঁধে নিল।

'চলিয়ে—'

তার পিছু পিছু মানিকতলা বাজারে ঢুকে পড়ল সত্যেন। টোটোও ঢুকতে যাচ্ছিল। মানা করল তাকে সত্যেন।

'তুই এইখানে বসে থাক।'

গেটের সামনে বসে পড়ল টোটো।

'আপকা কুত্তা হ্যয় বাবু ?'

'রাস্তাকা কুত্তা। হমারা সাথ দোস্তি হো গিয়া—'

'বহুত আচ্ছা।'

হো হো করে হেসে উঠল সে।

'আপকা নাম কিয়া, ভেইয়া—'

'রামেশ্বর। রামু—রামু কহ্‌তা হ্যয় সব কোই।'

'ঝাঁকা—ঝাঁকা—এই ঝাঁকা—'

একটি ভদ্রমহিলার কণ্ঠ শোনা গেল। অনেক তরকারিপাতি কিনেছেন, আকুলভাবে ঝাঁকা খুঁজছেন।

'আপ চলা যাইয়ে—'

রামু চুপি চুপি বলল।

সত্যেন এগিয়ে যেতেই ভদ্রমহিলা বললেন—'একটা ট্যাক্‌সিতে এগুলো তুলে দিতে হবে। কত নেবে ?'

রামুই জবাব দিল—'আট আনা মাইজি—'

'ওতনা লেগা ? কিছু কম কর বাবা।'

'নেহি মাইজি। আট আনা সে এক পয়সা কম হোবে না।'

মহিলা হয়তো আর একটু দরদস্তুর করতেন। কিন্তু ঠিক সেই সময় একটা লোক ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা সাফ করতে শুরু করে' দিলে। মহিলার ভয় হল তাঁর শাড়িটা নষ্ট হয়ে যাবে।

'চল চল। একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে হবে কিন্তু—'

রামুকে আর একজন ডাকাডাকি করছিল। রামু কিন্তু গেল না। জিনিসগুলি সত্যেনের ঝাঁকায় গুছিয়ে তুলে দিল।

'অব উঠাইয়ে—'

ঝাঁকাটা তুলে দিল তার মাথায়।

'চলিয়ে। ধীরে ধীরে—'

'এই ঝাঁকা—'

রামু সেদিকে কর্ণপাত করল না। সত্যেনকে ভিড় বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে

নিয়ে এল বিবেকানন্দ রোডের উপর।

'অব ট্যাকসি বোলাইয়ে—'

ঝাঁকাটা নামিয়ে দিল সে মাথা থেকে। তারপর চলে গেল। অনেক ছুটোছুটি করে একটা ট্যাক্সি যোগাড় করলে সত্যেন।

তারপর মালপত্র গাড়িতে উঠিয়েও দিল। মহিলা কিন্তু তাকে শেষ পর্যন্ত আট আনা দিলেন না। ছ'আনা দিয়ে বললেন—'এই বহুৎ হুয়া।'

চলে গেল ট্যাক্সি।

সত্যেনের মনে হল—এরাই সত্যিকারের দরিদ্র। বাইরেই শাড়ি ব্লাউজের জলুস, ভিতরটা একেবারে অন্ধকার।

তখনই মনে হল—এদের বলছি কাদের?

আমরাই তো এরা!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকা-ভরতি মোট নিয়ে বেরিয়ে এল রামু।

'ভিতর যাইয়ে। বহুত লোক ঝাঁকা খোঁজতা হায়—আজ লগন হ্যায়।'

সত্যেন আবার ভিতরে ঢুকে গেল।

নূতন জীবন আরম্ভ হয়ে গেল তার।

একবেলায় সে প্রায় তিন টাকা রোজগার করে ফেলল।

বেরিয়ে দেখল টোটো বসে আছে তার অপেক্ষায়। তাকে দেখে ঘন-ঘন ল্যাজ নাড়তে লাগল সে। একটা পাঁউরুটি কিনে দিলে তাকে। নিজেও খেল একটা। তারপর ঝাঁকা আর বাকি পয়সা সে রামুকে দিয়ে বললে—'আপকা পাস রাখ দিজিয়ে। ঝাঁকা কাল মিলেগা তো ফির কুছ রোজগার হোগা—'

'নাগিনা ঘর চলা গিয়া। ওহি ঝাঁকা সে কাম চলাইয়ে আভি। আপনা পাস রাখ দিজিয়ে। আপ রাতমে কাঁহা শোয়েগা?'

'ফুটপাথমে।'

'তব ঝাঁকা হামরা জিম্মা মে দে দিজিয়ে। আপ শো-যাইয়ে গা,

কই শালা চোরা লেগা—বহোত্ চোর হ্যায় চারো তরফ।'

বাজারের ভিতর শুয়েছিল সত্যেন আলুওলার দোকানের নীচে। টোটোও এসে শুয়েছিল তার কাছে গুটিসুটি হয়ে। সত্যেনের মনে হল—কুকুর কখনও অকুকুর হয় না। মানুষই অমানুষ হয়, ওইখানেই মানুষের বিশেষত্ব। মানুষই ভোল বদলায়, কোল বদলায়, ঝোলের দিকেই তার কেবল লক্ষ্য। এই ভোল বদলাবার বাহাদুরিই তার সভ্যতার ইতিহাস। মনে মনে এই পর্যন্ত কবিতা লিখে সে ভাবছিল আর কি লিখবে। এমন সময় তার মনে হঠাৎ ছবি ভেসে উঠল একটা। একটি তরুণী যেন ভ্রূ-ভঙ্গী করে চেয়ে আছে তার দিকে আর বলছে—'বুদ্ধ, যীশু, শঙ্কর, শ্রীরামকৃষ্ণ এঁরা?'

সত্যেন চোখ বুজে মনে মনেই উত্তর দিলে—'ওঁরাও ভোল বদলেছেন। কিন্তু সে বদলানোটা আমাদের মনোমত হয়েছে বলেই আমরা ওঁদের বাহবা দিচ্ছি, ওঁদের ছবি ঘরে টাঙাচ্ছি। কিন্তু ওকথা থাক আমি বড় ক্লান্ত, আমাকে একটু চা করে দেবে?'

চোখ খুলে দেখল কেউ কোথাও নেই।

টোটো গোল হয়ে ঘুমুচ্ছে।

সত্যেনও ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল—আইনস্টাইন তাকে বলছেন, থিয়োরি অব রিলেটিভিটি তুমি তো পড়েছ। তবে ঘাবড়াচ্ছ কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর স্বপ্ন দেখল, কলেজ স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে সে যেন বক্তৃতা করছে। বলছে, বাঙালী জাতকে বাঁচতে হবে। বাঁচতে হবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে। বাঁচতে হবে শ্রমজীবী হয়ে, চাকুরিজীবী হয়ে নয়। ইংরেজরা সমস্ত বাঙালী জাতটাকে কেরানীর জাত করে দিয়ে গেছে, নূতন স্লেভ ডাইনাস্টি সৃষ্টি করেছে মেধাবী বাঙালীদের দিয়ে। আমরা সবাই কেরানী—কেরানী হবার জন্যেই আমাদের পড়াশোনা—জ্ঞানলাভ করবার জন্যে নয়। আমরা যেন-তেন-প্রকারেণ পরীক্ষা পাস করতে শিখেছি, আর কিছু

শিখিনি। আমরা মূর্খ প্রভুপদলেহী দাস, আর কিছু নই। আমাদের কোট-প্যাণ্ট, সুট-বুট মোটর রুম-কুলার দাসত্বের ভূষণ। চাকরি গেলেই আমরা ফতুর। কিন্তু সত্যিই কি আমরা অত নির্বীর্য, অত হীন? না, না, নিশ্চয় নয়। আমরা মোহগ্রস্ত। এই মোহের ছলনায় আমরা প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতার কুৎসিত কাদা ছোড়াছুঁড়ি করছি। আমি যখন মোট বইতাম, তখন রামু ছিল আমার ভাইয়া, রমজান ছিল আমার চাচা, ফলওয়ালী ছিল আমার দিদি। আমি চিরকাল মোট বইনি, ব্যবসা করেছি, ব্যবসায়ে উন্নতি করেছি, অনেক টাকা রোজগার করেছি, তোমাদের প্রকৃত শিক্ষার জন্যে বিদ্যালয় করেছি--তোমরা সব এস, প্রকৃত মানুষ হও, চাকরি করবার জন্যে লেখাপড়া শিখবে না, মানুষ হবার জন্য লেখাপড়া শিখতে হবে। উপার্জন কর শ্রম দিয়ে। পেশীর শ্রম দিয়ে, মস্তিষ্কের শ্রম দিয়ে, স্বাধীনভাবে, মাথা উঁচু রেখে। ভেবে দেখেছ কি কতকগুলো অসাধু লোকের পায়ে তেল দিয়ে দিয়ে কী অমানুষ হয়ে গেছ তোমরা? তোমাদের মানুষ হতে হবে। মানুষের মতো মানুষ, যে মানুষ পৃথিবীর গর্ব হবে। বাঙালীর ছেলেরা কি না পারে। তোমরাও পারবে, নিশ্চয় পারবে—

'আরে এখানে শুয়ে আছে কে হে। ওঠ, ওঠ। আলুর বস্তা নামাব।'

'কে তুমি—'

'আমি ঝাঁকামুটে।'

'এত বেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্ছ?'

সত্যেন উঠে বাইরে চলে গেল। লজ্জা হল তার।

সেই দিনই বেলা পাঁচটার পর।

রাস্তায় খুব ভিড়। তারই ভিতর দিয়ে চলেছিল সত্যেন ঝাঁকা মাথায় নিয়ে। ঝাঁকায় অনেক জিনিস। চাল ডাল তরকারি মসলা

একটা তরমুজ একটিন তেল। বেশ ভারী। ঝাঁকাটা দুহাত দিয়ে ধরে টলতে টলতে যাচ্ছিল সত্যেন। সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি গাড়ি পার্ক করেছিলেন একটু ফাঁকা জায়গায়। বেশ দূর সেটা। হয়তো সত্যেন সেখানে পৌঁছে যেত, কিন্তু পারলে না। একটা লরি এসে ধাক্কা মারলো তাকে। পড়ে গেল সে। তারপর কি হল—তার মনে নেই। কিন্তু মন তার নিষ্ক্রিয় ছিল না। ছবি আঁকছিল। ...দলে দলে ছেলে ঘিরে ধরেছে তাকে। তার বিদ্যালয়ে ঢুকতে চায়—তার মানুষ হবার বিদ্যালয়ে—সেখানে পরীক্ষা নেই, ডিগ্রি নেই—একটি সুন্দরী তরুণী অভ্যর্থনা করছে তাদের। বলছে—তোমরা বস, কিছু খেয়ে যাও, সব্বাইকে ভরতি করব আমরা, কেউ ফিরে যাবে না—বিরাট একটা ময়ূরপঙ্খী ভেসে চলেছে সমুদ্রে—নূতন যুগের চাঁদ সদাগর সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছে...প্রকাণ্ড ল্যাবরেটরিতে মাইক্রোসকোপে চোখ লাগিয়ে বসে আছে বিজ্ঞানীর দল—হ্যাঁ তারই ছাত্র সব—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ঘুরে ঘুরে দেখছেন, বলছেন তুই-ই আমার স্বপ্ন সফল করলি শেষ পর্যন্ত। আদর করে পিঠে একটা ঘুঁষি মারলেন।...বয়েল গাড়ির গাড়োয়ান ভিকুও এগিয়ে এল, সে তার নাইট স্কুলে রোজ পড়াশোনা করে, গানও করে তুলসীদাসের রামায়ণ। টিকলুও এসেছে। বলছে—আমার দেহের ক্ষিধে মিটে গেছে। মনের ক্ষিধে মেটেনি কিন্তু। তুই তার ব্যবস্থা করে দে। রামায়ণ মহাভারত? না, আমি পড়িনি। তাই পড়ব? বেশ। হঠাৎ ভামা এসে বলল, আমিই আপনাকে পড়াব। আসুন না। সাতকড়ি দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে। বলছে অনেক পাখীর ছবি যোগাড় করেছি আমি। আমাদের দেশের সব পাখীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব তোমাদের। শুধু ছবি দেখলে চলবে না কিন্তু, আমার সঙ্গে মাঠে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হবে। দলে দলে ছেলে আসছে......দলে দলে মেয়ে......

বাঙালী জাত জেগে উঠেছে...বাঙালী জাত জেগে উঠেছে...আরও

কি সব হিজিবিজি···দূরে যেন তার মামী দাঁড়িয়ে রয়েছেন, চোখ দিয়ে জল পড়ছে তাঁর। মামা বড্ড বুড়ো হয়ে গেছেন। কপালের ওপর হাত রেখে দেখছেন অবাক হয়ে। ওদিকে ও কে? সেই ছাতুওলিটা হাসছে আর বলছে— আমি সুরপতিয়া। ছাতু এনেছি। আমাকে ভুলে গেলে?···ছবির পর ছবি আসছে আর যাচ্ছে···ছবির পর ছবি···রাস্তায় ভিড়··অনেকগুলো মোটর হর্ণ দিচ্ছে··

তার যখন জ্ঞান হল তখন দেখলে মাথায় হাতে পায়ে সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। একটি কোট-প্যান্ট পরা ভদ্রলোক তার নাড়ি দেখছেন।

'আমি কোথায় আছি?'

'হাসপাতালে।'

'আপনি কি ডাক্তারবাবু?'

'হ্যাঁ—'

সত্যেন হঠাৎ আকুল কণ্ঠে বলে উঠল—'আমি বাঁচব তো ডাক্তারবাবু! আমি না বাঁচলে যে বাঙালী জাতকে বাঁচাতে পারব না। বলুন, আমি বাঁচব তো?'

'নিশ্চয় বাঁচবে, ভয় কি! একটা ইনজেকশন দিয়ে যাচ্ছি— ঘুমোও এখন।'

ইনজেকশন দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন।

'আমার টোটো কোথায় বলতে পারেন?'

'টোটো কে?'

'আমার কুকুরটা।'

'জানি না তো—'

টোটো হাসপাতালের সিঁড়ির কাছে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে ছিল।

॥ সমাপ্ত ॥